Bangladesh Journal of Political Economy

© 2015 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 31, No. 2, December 2015, pp. 071-114
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

অর্থনীতি শাস্ত্রের বিকাশ ও নব্য-উদারবাদী মতবাদ: ‘দর্শনের দারিদ্র্য’ প্রসঙ্গে

আবুল বারকাত*

সারকথা *বিগত সাড়ে ৫ শত বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ১৯৬০ দশক যখন থেকে নব্য-উদারবাদীদের উত্থান– এ সময়টুকু বাদ দিলে পিছনের ৫০০ বছরের অর্থনীতি শাস্ত্র মূলত দুটি বৃহৎ বর্গের প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর অনুসন্ধান করেছে: (১) সম্পদের উৎস কি, কে সম্পদের স্রষ্টা, এবং সম্পদ কোথায় সৃষ্টি হয়? (২) বাজার ব্যবস্থা কিভাবে চলা উচিত? মুক্ত-অবাধ বাজার, মুক্ত কর্ম প্রচেষ্টা, মুক্ত বাণিজ্য নাকি বাজারে ভূস্বামী-সামন্তপ্রভু-রাজা-সম্রাট-রাষ্ট্র-সরকারের হস্তক্ষেপ-নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব থাকতে হবে? বিগত সাড়ে ৫ শত বছর ঐ দুই প্রধান বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মত কোন সদুত্তর মেলেনি। এসব বিষয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা করেছেন তাদের প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তার কালের নিয়ামক-নিয়ন্ত্রক শ্রেণির শ্রেণিস্বার্থ রক্ষাকারী আজ্ঞাবাহী মাত্র। কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন দাসভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জিইয়ে রাখতে, কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন সামন্তবাদ টিকিয়ে রাখতে, কেউ ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী যুগে আগত নতুন শ্রেণির, কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন পুঁজিবাদের, কেউ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদের, আবার কেউ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদের। ব্যতিক্রম শুধু কার্ল মার্কসের অর্থনীতিসাহিত্য যেখানে অতীতের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পদ্ধতিতত্ত্ব প্রয়োগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিধি বিধানের ভিত্তিতে সামাজিক বিশ্ববীক্ষার আওতায় শুধু ঐতিহাসিক উত্তরণশীল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাতত্ত্বই আবিষ্কৃত হয়নি, যেখানে প্রমাণ হয়েছে যে কোন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাই স্থির-অনড় নয়, তা নিয়ত পরিবর্তনশীল। মার্কসের পুঁজিবাদ বিশ্লেষণের এ কাঠামো সূত্রে নির্মোহতা, সমগ্রতা, বস্তুনিষ্ঠতা এবং ঐতিহাসিকতা আছে আর সর্বোপরি আছে সর্বজনীনতা। মার্কসের আগে ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথ অর্থশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনকে সুসংহত-সুসংবদ্ধভাবে অন্তত মূল্যের শ্রমতত্ত্ব ও বাজারের জটিল বিষয়াদির বিশ্লেষণ করে সূত্রবদ্ধ করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। কিন্তু মার্কসের আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতি শাস্ত্রের মার্কস পরবর্তী ধারাসমূহ অর্থনীতি শাস্ত্রকে খণ্ডিত ও কামরাভুক্ত করে যত ধরনের উপযোগিতার তত্ত্ব খাড়া করা যায় তা দিয়ে ধ্রুপদী চিন্তা জগতের মূল্যের শ্রমতত্ত্বকেই বিসর্জন দিলো– এটা করা হলো বেশ সচেতনভাবেই এবং এর ফল যা হবার তাই হলো: অর্থনীতি শাস্ত্র যুক্তির জগৎ থেকে নিজেকে সযত্নে সরিয়ে নিল, ফলে শাস্ত্রের ‘দর্শনের দারিদ্র্য’ মহাদারিদ্র্যে রূপান্তরিত হল। বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের পশ্চাদপসারণের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষা বিশেষত সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পতন পরবর্তীকালে একমেরুর বিশ্বে বৈশ্বিক সকল প্রাকৃতিক সম্পদে (জল সম্পদ, জ্বালানি-খনিজ সম্পদ, আকাশ-*

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মহাকাশ সম্পদ) আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একক নিরঙ্কুশ মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থনীতি শাস্ত্রে আবির্ভূত হয়েছে নব্য-উদারবাদী মতবাদ। এ মতবাদ কোন সুস্থিত দর্শন কিনা বলা ভার তবে বিশ্বে পুঁজি যখন কেন্দ্রে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদসহ পশ্চিমা ধনী দেশে উদ্বৃত্ত তখনই এ মতবাদ নতুন করে শুধুমাত্র মুক্তবাজার, অবাধ বাণিজ্য, নিরঙ্কুশ ব্যক্তিমালিকানার কথা বলেই ক্ষান্ত হয় না, দুনিয়া কব্জা করতে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষাকারী বৈশ্বিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক সংস্থা গড়ে তুলে বিশ্ব বাজার, বিশ্ব বাণিজ্য, বিশ্ব অর্থনীতি পরিচালনের মারাত্মক সব বিধি-বিধান-নিয়ম-কানুন রচনায় ব্যস্ত। এবং শুধু তাই নয় ঐসব একপেশে বিধি-বিধান-নিয়ম-কানুন না মেনে চললে দুর্বলের শাস্তির বিধান তৈরিরও দায়িত্ব নিজে নিজেই নিয়েছে, ফলে দুর্বল দেশের (উন্নয়নশীল, উন্নয়নকামী, স্বল্পোন্নত, 'গরীব' দেশ) সার্বভৌমত্ব বলে কিছু থাকছে না। এ এক মহাবিপর্যয়– প্রাকৃতিক নয়, মনুষ্য সৃষ্ট। এ মহাবিপর্যয় থেকে মনুষ্য সমাজকে মুক্তি দিতে হলে অর্থনীতি শাস্ত্রকে শাস্ত্রীয় 'দর্শনের মহাদারিদ্র্য' থেকে বেরিয়ে আসতে হবে– যত না শাস্ত্রের প্রয়োজনে তারচে অনেক বেশি বিশ্ব-জনগণের ভবিষ্যৎ প্রাগ্রসর জীবনের প্রয়োজনে। এখন অর্থনীতি শাস্ত্রের কাজ হবে আধুনিক চরম বৈষম্যমূলক অসম বিশ্বের রাজনৈতিক-অর্থনীতির অন্তর্নিহিত নিয়ামক বিষয়াদির বস্তুনিষ্ঠ-নির্মোহ বিশ্লেষণপূর্বক 'নতুন এক একীভূত অর্থশাস্ত্র' বিনির্মাণ করে তারই ভিত্তিতে 'নতুন মানবিক উন্নয়ন দর্শন' প্রণয়ন। জটিল এ প্রক্রিয়ার কার্য-কারণ ব্যাখ্যা-বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক পৃথিবীর মানুষকে সঠিক পথনির্দেশনা দিতে হয়তোবা প্রয়োজন সামাজিক বিজ্ঞানের কার্ল মার্কসের মত 'মহাজ্ঞানী' দার্শনিকসহ প্রকৃতি বিজ্ঞানের কোপারনিকাসের মত 'মহা বিজ্ঞানী' ও 'জ্ঞান শাস্ত্রের মহাগৌরব' গিত্তর্দানো ব্রুনোর মত নির্মোহ দার্শনিকদের সমন্বিত উদ্যোগ। কিন্তু ততক্ষণ বসে না থেকে আমাদের কাজ হবে অনিবার্য এ পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার একক ও যৌথ প্রয়াস অব্যাহত রাখা।

নির্যাস শব্দগুচ্ছ : *অর্থনীতি শাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাস, অর্থনীতি শাস্ত্রের মূলধারা, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও অর্থনীতি শাস্ত্র, অর্থনীতি শাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য, দর্শন ও অর্থনীতি, মানব বিবর্তন ও অর্থনীতি, ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্র, মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র, নব্য-উদারবাদ, নতুন অর্থনীতির দর্শন, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ভবিষ্যতের অর্থশাস্ত্র, সম্পদ, বাজার।*

১। ভূমিকা

অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় 'দর্শনের দারিদ্র্য' বিষয়ে এ পর্যন্ত কেউ তেমন কিছু বলেননি, লেখেননি। বিষয়টি জটিল এবং শুধুমাত্র অর্থনীতি শাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিষয়টি জটিল এ জন্য যে অর্থনীতি শাস্ত্রের সুনির্দিষ্ট চিন্তা-দর্শন একদিকে যেমন সমসাময়িক ঐতিহাসিক সময়ের সাথে সম্পর্কিত এবং ঐ যুগের 'নিয়ামক ক্ষমতা কাঠামোর' (dominant power structure) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সুতরাং ঐ চিন্তা-দর্শন বিশ্লেষণে সে যুগের আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাস নির্মোহভাবে জানতে হবে আর অন্যদিকে অর্থনীতি শাস্ত্র যেহেতু উদ্ভব সূত্রেই নীতি-নৈতিকতা শাস্ত্রীয়, মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রীয় এবং বিচারবোধ কেন্দ্রিক এবং যথেষ্ট মাত্রায় এলোমেলো সেহেতু অর্থশাস্ত্রের চিন্তা দর্শন বিচারে এসব বিষয়কেও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হবে।

আমার এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য ব্যাপক-বিস্তৃত অর্থনীতি শাস্ত্রের চিন্তা দর্শনের ইতিহাস (History of Economic Thoughts) রচনা নয়। এসব বিচার-বিশ্লেষণ করেই প্রবন্ধেরদ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করেছি নির্যাস কথা যা আসলে আমার উপসংহারিক বক্তব্য। যেহেতু অর্থনীতি শাস্ত্রের বর্তমান যুগ হল

এক মেরুর বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা উদ্দিষ্ট নব্য-উদারবাদীদের (Neo-liberalism) যুগ সেহেতু প্রবন্ধের চতুর্থ (শেষ) অনুচ্ছেদে নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি ধারার মতবাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বিশ্বায়নের যুগে বৈশ্বিক অর্থনীতির মহাসংকট ও মহামন্দার বিংশ শতকেরদ্বিতীয়ার্ধ ও একবিংশ শতকে অর্থনীতি শাস্ত্রের দর্শনগত মহাদারিদ্র্যের লক্ষণসমূহ উত্থাপন করেছি। নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি চিন্তা দর্শনগতভাবে প্রকৃত অর্থে অতীতের সকল অর্থনীতি চিন্তা থেকে পশ্চাৎপদ যার উদ্দেশ্য এমনকি নীতিশাস্ত্রীয় মানবকল্যাণ চিন্তার ধারে কাছেও নেই, যা আসলে দর্শন চিন্তাও নয়, যা প্রধানত প্রায়োগিক-প্রেসক্রিপশন জাতীয় (Prescriptive instrumental economics)। অর্থনীতি শাস্ত্রের নব্য-উদারবাদী মতবাদটি সেসব পথ-পন্থা-পদ্ধতি বাতলে দেয় যা মুক্তবাজারের নামে (যে মুক্তবাজার কখনও মুক্তও নয়, এবং নয় তা দরিদ্র বান্ধব) শ্রেণিসমাজে বৈষম্য বাড়াতে বদ্ধ পরিকর, যাদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মূলত সাম্রাজ্যবাদের ভরকেন্দ্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখার কৌশলাদি বাতলে দেয়, যা অনৈতিক এবং অতিমাত্রায় আগ্রাসী। উদারবাদের স্বর্ণযুগ ("Golden age of Liberalism") অর্থাৎ ১৮৭০-১৯১৩ কালপর্ব যা ছিলো ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের যুগ–তার তুলনায়দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯৪৫ পরবর্তী) মার্কিন আধিপত্যবাদের যুগ অনেক বেশি নির্মম, নিষ্ঠুর, বর্বর। আর মার্কিন আধিপত্যবাদের এ যুগের অর্থনীতি শাস্ত্রীয় কুট পরামর্শদাতাদের মতবাদই হল নব্য-উদারবাদ। নব্য-উদারবাদ সে পরামর্শই দেয় যা বাস্তবায়নে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের সকল মৌল-কৌশলিক সম্পদে, যেমন (১) জল সম্পদ, (২) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, (৩) আকাশ-মহাকাশ সম্পদে তাদের অভিগম্যতা নয় (not just access)– নিরঙ্কুশ মালিকানা (absolute ownership) ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ (absolute control) প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। নব্য-উদারবাদী অর্থশাস্ত্রীয় মতবাদ সে পরামর্শই দেয় যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈষম্য-অসমতা বাড়লে বাড়ুক, বাড়ুক বিশ্বের প্রায় ৮০০ কোটি মানুষের বঞ্চনা-বিচ্ছিন্নতা (alienation অর্থে) কিন্তু যে কোন পথে যে কোন পদ্ধতি ও পন্থায় উল্লিখিত তিনটি বৈশ্বিক মৌল-কৌশলিক সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হোক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-আধিপত্য। এ আধিপত্য বাস্তবায়নে নব্য-উদারবাদীদের পরামর্শ একদিকে বৈশ্বিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিধি বিনির্মাণ প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (ডাবলুটিও)-কে নিজের মত কাজে লাগাতে হবে অন্যদিকে প্রয়োজনে বিশ্বের যে কোন দেশে সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা ব্যবহারসহ যে কোন পথ-পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যা যত বেশি 'ক্রিমিনাল' মাত্রারই হোক না কেন[১]। এসবই নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি শাস্ত্রের দর্শনের মহাদারিদ্র্যের একই সাথে কারণ ও পরিণাম। একদিকে অর্থনীতি শাস্ত্রের দর্শনগত 'মহাদারিদ্র্য' আর অন্যদিকে বৈশ্বিক মহাবিপর্যয়ের আলামত– এ দুই কারণে প্রবন্ধের শেষ (চতুর্থ) অনুচ্ছেদেই অর্থনীতি শাস্ত্রের নতুন তত্ত্ব-দর্শন বিনির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছি।

---

১ এসবের অসংখ্য উদারহণের একটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সত্য এ উদাহরণটি দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র একজন প্রাক্তন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা 'ইকনমিক হিটম্যান' জন পার্কিনস। তিনি লিখেছেন "ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট জেইমি রোলডস ও পানামার প্রেসিডেন্ট ওমর টোরিজসকে আমি তাদের দেশপ্রেম ও সজ্ঞান-চেতনার জন্য খুবই সম্মান-শ্রদ্ধা করতাম। ঐ দুজনই কয়েক দিনের ব্যবধানে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। তাদের মৃত্যু আসলে দুর্ঘটনা ছিল না। আসলে তাদের হত্যা করা হয়েছিলো। কারণ তারা উভয়েই বিশ্ব সাম্রাজ্যের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন, সরকার ও ব্যাংক-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন...। ভয়-ভীতি অথবা ঘুষ-দুর্নীতি সবসময়ই আমার পথ রূদ্ধ করে রেখেছিলো" (দেখুন, John Perkins. 2006. Confessions of An Economic Hit Man. The shocking inside story of how America REALLY took over the world. পৃঃ ix)।

প্রবন্ধের চতুর্থ অনুচ্ছেদে নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি মতবাদের 'দর্শনের মহাদারিদ্র্য' প্রসঙ্গটি উত্থাপনের আগে তৃতীয় অনুচ্ছেদে নব্য-উদারবাদের দর্শনগত মহাদারিদ্র্যের ভিত্তি বা ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী (stage setting matters) অর্থনীতি শাস্ত্রের বিগত সাড়ে ৫০০ শত বছরের অন্যান্য বিভিন্ন মূল ধারার সংক্ষিপ্ত বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক 'দর্শনের দারিদ্র্য' ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। আর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের জ্ঞান-তৃষ্ণা মেটানোর প্রয়োজন বোধের কারণে প্রবন্ধের শেষে "অর্থনীতি শাস্ত্রের বিকাশে ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট দর্শন সহায়ক প্রবন্ধ/গ্রন্থসমূহ" শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হয়েছে।

২। নির্যাস কথা: উপসংহারিক বক্তব্য

অর্থনীতি শাস্ত্রে মৌলিক আবিষ্কার অথবা মৌলিক চিন্তা খুব একটা নেই বললে অতিকথন হবে না। বেশির ভাগ অর্থনীতি চিন্তা-দর্শন স্থান-কালভেদে সমসাময়িক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আবর্তিত। এসবে মৌলিকত্বের সর্বজনীনতা নেই বললে অত্যুক্তি হবে না বলছি এ কারণে যে অর্থশাস্ত্রীয় ঐসব চিন্তার গুণ-মানসহ গুরুত্বের সর্বজনীনতা 'মহাবিজ্ঞানী' দার্শনিক কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) অথবা 'জ্ঞান শাস্ত্রের মহাগৌরব' দার্শনিক গিওর্দানো ব্রুনোর (১৫৪৮-১৬০০) "ব্রহ্মাণ্ডের সূর্যকেন্দ্রিক ধারণার" মত নির্মোহ ধ্রুব সত্য নয়। এ নিরিখে এমনকি কার্ল মার্কসের অর্থশাস্ত্রীয় চিন্তাও শ্বাশ্বত নয় কারণ তিনি পুঁজিবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন যে পুঁজিবাদ তাঁরই মতে সভ্যতার ইতিহাসে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার (Socio-economic Formation) ঐতিহাসিক চতুর্থ বৃহৎ স্তর মাত্র; যে পুঁজিবাদ তাঁরই মতে শেষ স্তর নয় (এ বিষয়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে)।

অর্থনীতি শাস্ত্রে চিন্তার মৌলিকত্ব দাবিদার হিসেবে যেসব নাম স্বীকৃতি পেয়েছে এবং প্রায়শই তর্কাতীত যে সব নাম উল্লেখ করা হয় তারা প্রধানত কয়েকটি বিষয়ে দার্শনিক এবং/অথবা প্রায়োগিক ভাবনার প্রাগ্রসর ভাবুক। আর সংশ্লিষ্ট দর্শন চিন্তায় যেসব প্রশ্নগুচ্ছ প্রাধান্য পেয়েছে তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জরুরি। কারণ গত সাড়ে ৫ শত বছরের অর্থশাস্ত্রের মৌলিকত্ব নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে আমি এ শাস্ত্রের গুরুদের ভাবনা-চিন্তাকে 'দর্শনের দারিদ্র্য' হিসেবে অভিহিত করছি। আসা যাক অর্থনীতি শাস্ত্রের সেসব মৌলিক প্রশ্নগুচ্ছের কথায় যা এ শাস্ত্রে প্রাধান্য পেয়েছে এবং যারই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ঐ শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় গুরুদের 'নমস্য দার্শনিক' বলা হয়ে থাকে। এসব প্রশ্নকে দুটি প্রশ্নগুচ্ছে ভাগ করে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিচে উপস্থাপন করা হল:

> প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ: সম্পদের (wealth) উৎস কি? কে সম্পদ সৃষ্টি করে? কোথায় কোন খাত-ক্ষেত্রে সম্পদ সৃষ্টি হয়? সম্পদের উৎস সংশ্লিষ্ট কার্যকারণ নির্ণয় করে কেউই কোপার্নিকাসের মত 'মহাবিজ্ঞানি' অথবা গিওর্দানো ব্রুনোর মত 'জ্ঞান শাস্ত্রের গৌরব' হতে পারেন না। কেনো? সহজ উত্তর– মানব বিবর্তনের ইতিহাসের[২] অধিকাংশ সময়কালের জন্য এ প্রশ্নটিই প্রযোজ্য নয়। এ প্রশ্ন ও সংশ্লিষ্ট ভাবনা-চিন্তা প্রযোজ্য শুধুমাত্র তখন থেকে যখন সম্পদ পুঞ্জিভূত করার প্রশ্ন আসলো অর্থাৎ মানব সভ্যতার বিবর্তনে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দ্বিতীয়

[২] ভূতত্ত্বীয় গবেষণায় পৃথিবীর বিবর্তনকে সময়ানুক্রমে চার ভাগে ভাগ করা হয়: (১) প্রিক্যামব্রিয়ান, (২) প্যালিওজয়িক, (৩) মেসোজয়িক, (৪) সিনোজয়িক। এসবের সাথে যুক্ত মানব বিবর্তন। পৃথিবীর সৃষ্টি আজ থেকে ৪৫০ কোটি বছর বা তারও আগে; প্রথম জীবন্ত কোষ সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে ২৫০-৩৮০ কোটি বছর আগে; প্রথম বিশালদেহি ডাইনোসর জাতীয় প্রাণিদের সৃষ্টি আজ থেকে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে ৬ কোটি বছর আগে; দুই পায়ে দাঁড়ানো কিন্তু সামনের দিকে একটু ঝুকে থাকা লেজবিহীন চেহারায় বানর কুল সদৃশ মানুষ এসেছে এখন থেকে ১৮ লক্ষ থেকে ৫০

বৃহৎ বর্গের স্তর থেকে– দাস যুগ থেকে। কিন্তু মানব ইতিহাসের কমপক্ষে ৯৯ শতাংশ সময়কালই তো আদিম সাম্যবাদী সমাজ। আর মানব ইতিহাসের ৯৯ শতাংশ সময়কালের আদিম সমাজে সম্পদের উৎস সংশ্লিষ্ট এ প্রশ্নটিই অবান্তর। অবান্তর প্রশ্ন নিয়ে আর যেই ভাবুক দার্শনিকদের ভাববার কোন কারণ নেই। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতদের এ নিয়ে ভাবতে হয়েছে। কারণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা আদিম যুগের উৎপাদিকা শক্তির বিবর্তন জানতে হয়েছে। যে বিবর্তনের ফলে যত সময় পরেই হোক এসেছে দাস যুগ। সঙ্গত কারণেই শোষণ ভিত্তিক প্রথম আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা দাস যুগ থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক পুঁজিবাদ পর্যন্ত সময়কালে নির্দিষ্ট গোষ্ঠির সংখ্যাস্বল্প কয়েকজনের স্বার্থ সংরক্ষণে অর্থনীতির শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের ভাবতে হয়েছে। আর ভাবতে ভাবতে দাস যুগ থেকে মধ্যযুগের দাসমালিক-ভূস্বামী জমিদার-সম্রাট-রাজা-বাদশাহদের উপদেষ্টা হিসেবে অর্থনীতি শাস্ত্রের ভাবুকদের এক পর্যায়ে এমনও বলতে হয়েছে যে "যুদ্ধ ভাল, যদি জেতার সম্ভাবনা থাকে" (যেমন মাকেন্টাইলিস্ট বা বাণিজ্যবাদী অথনীতিবিদ-পণ্ডিতদের), আর একই কথা কিন্তু আজকের সাম্রাজ্যবাদী যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরতলার গুটিকয়েক মানুষের স্বার্থে নোবেল বিজয়ি অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যানকে বহু 'চিন্তা-ভাবনা' করে বলতে হয়েছে "ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইরাক দখল করা মার্কিন অর্থনীতির জন্য ভাল হবে"। অবশ্য এ কথাও সত্য যে সম্পদের উৎস সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করে অষ্টাদশ শতকের ফরাসি চিকিৎসক-অর্থনীতিবিদ ফিজিওক্রাট ফ্রাঁসুয়া কেনে হিসেবপত্তর কষে 'ট্যাবলু ইকনমিকে' (যা ছিল অর্থশাস্ত্রের প্রথম ম্যাক্রোইকনমিক মডেল)-তে রাজ-রাজরাসহ সামন্ত প্রভুদের উদ্দেশ্যে বললেন "ফরাসি কৃষকদের ২০০ বছরের স্থবিরতার জন্য তোমরাই দায়ী"; "কৃষিতে মধ্যস্বত্বভোগী সামন্তপ্রভু যতদিন থাকবে ততদিন কৃষক কুলের জীবনে উন্নতির কোনই সম্ভাবনা নেই, অতএব উন্নতি চাইলে সামন্তপ্রভুদের উপর উচ্চহারে কর বসানোর বিকল্প নেই"। এসব কথা স্মরণ করানোর পেছনে আমার দুটো প্রধান উদ্দেশ্য আছে। প্রথম উদ্দেশ্য হল এ কথা প্রমাণ করা যে সম্পদ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুচ্ছ মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বজনীন নয়, তা উত্তরণ পর্বের ইস্যু, এবং পর্বটি ইতিহাসের সময়কাল-ব্যাপ্তি বিচারে স্বল্পকালীন। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল এ কথা প্রমাণ করা যে সম্পদ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুচ্ছের ভাবনা-চিন্তাকারী 'পণ্ডিত' অর্থনীতিবিদদের মূল লক্ষ্য ছিল দাস মালিক-ভূস্বামী-সম্রাট-রাজা-বাদশা-সামন্তপ্রভু-পুঁজিপতি-সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা। অতএব, বিষয়টি সার্বজনীনও নয়, মানবকল্যাণ উদ্দিষ্টও নয়। তাহলে সম্পদের উৎসসহ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাদির অনুসন্ধান উদ্দিষ্ট অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতদের চিন্তা-ভাবনা আসলেই তাদের 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রতিফলিত করে– এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দিহান।

লক্ষ বছর আগে (বিবর্তন শাস্ত্রের বিজ্ঞানীরা যাদেরকে বলেন 'হোমো এরিকটাস'), আর বিবর্তনের এ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ সোজা হয়ে হাঁটা এবং চেহারাতেও বানর সদৃশ্যতা নেই অর্থাৎ 'মানুষ' যাদেরকে বিবর্তন শাস্ত্রের বিজ্ঞানীরা বলেন 'হোমো স্যাপিয়েন্স'– এই মানুষের আগমন এখন থেকে ৫ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ বছর আগে। 'হোমো স্যাপিয়েন্স' এই মানুষই পরবর্তীকালে হোলোসিন যুগে আধুনিক মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। (বিস্তারিত দেখুন, Russell Ash. 2006. Whitaker's World of Facts. pp. 34-35; Knowledge Encyclopaedia-The Big Book of Knowledge, 2012. pp. 180-181; John. H. Postlethwait, Janet.J.Hopson. 1992. The Nature of Life. pp. 418-426).

দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ: বাজার ব্যবস্থা কিভাবে চলা উচিত? মুক্ত-অবাধ বাজার, 'মুক্ত কর্ম প্রচেষ্টা', 'মুক্ত বাণিজ্য' (laissez faire, laissez passer) নাকি বাজারে সম্রাট-রাজা-বাদশাহ-রাষ্ট্র-সরকারের হস্তক্ষেপ থাকতে হবে? এখানেও প্রথম প্রশ্নগুচ্ছের অনুরূপ সমজাতীয় কথা প্রযোজ্য। আর তা হল: উৎপাদন-বিনিময়-বণ্টন-পরিভোগ (production-exchange-distribution-consumption)– এ সমীকরণের পূর্ণাঙ্গ রূপ ইতিহাসের কাল বিচারে বেশি দিন আগের কথা নয়। এ সমীকরণে মানুষের ভোগ-পরিভোগের (consumption) ব্যাপারটা মানব সভ্যতার উষালগ্নের প্রশ্ন। কারণ প্রাণিজগত বা জীবজগতের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় (human evolution) মানুষ যখন থেকে মানুষ হলো তখন থেকেই তাকে খাদ্য ভোগ-পরিভোগের ভাবনা ভাবতে হয়েছে। আর সেটাও তো আদিম সাম্যবাদী যুগের কথা– ৫০ লক্ষ বছর আগের কথা। মানুষের হোমো এরিকটাস থেকে হোমো স্যাপিয়েন্সে রূপান্তরে এবং দীর্ঘকাল হোমো স্যাপিয়েন্স অবস্থায় বিবর্তিত হবার ইতিহাসে প্রথমে মানুষ চার পা থেকে উঠে দুই পায়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ প্রক্রিয়ায় মানুষ প্রকৃতিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা খাদ্য-সম্পদ (বন-জঙ্গলের মাটিতে পড়ে থাকা ফলমূল, জলাভূমির পাড়ে পড়ে থাকা মাছ-কাকড়া জাতীয় প্রাণী, মৃত পশু-পাখি ইত্যাদি) সংগ্রহ করে জীবন পরিচালন করেছে। এভাবে সংগ্রহবৃত্তিক কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক মানব জীবন চলেছে লক্ষ লক্ষ বছর। প্রকৃতি ছিল বিরূপ। শৈত্য প্রবাহ থেকে শুরু করে ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস আর জীবজন্তুর সাথে লড়াই-সংগ্রামে মানুষ যাযাবর জীবনে বাধ্য হয়েছে। এসবের ফলে কোন এক পর্যায়ে প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ-বৃত্তিক কর্মকাণ্ড মানব চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট হয়নি। এ প্রক্রিয়ায় পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে অস্তিত্ব রক্ষা ও জীবন পরিচালনে প্রকৃতির সাথে লড়াই-সংগ্রাম করে বহু লক্ষ বছর চিন্তা-ভাবনার ফলে মানুষ আবিষ্কার করেছে পৃথিবীর প্রথম শ্রম-হাতিয়ার (instrument of labor)। যেটা সম্ভবত ছিল লাঠিজাতীয় এবং/অথবা ইট-পাথর জাতীয় কোন হাতিয়ার যা ব্যবহার করে গাছে না উঠে আবিস্কৃত ঐ শ্রম-হাতিয়ার ছুঁড়ে ফল পেড়ে মানুষ ক্ষুধা নিবারণ ও বংশ রক্ষা করেছে। এই শ্রম হাতিয়ারটাই বলা চলে মানুষের উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রারম্ভ কাল, যে আবিষ্কার মানুষকে জীবজগতের অন্যান্য সব প্রাণীকুল থেকে আলাদা সত্তায়, উচ্চতর সত্তায় রূপান্তর ঘটিয়েছে। এটাই হল মানুষের সংগ্রহবৃত্তিক কর্মকাণ্ড (collectionist activities) থেকে শিকারভিত্তিক অর্থনীতিতে (hunting economy) রূপান্তর ভিত্তি। সেইসাথে এরই ফলে একদিকে যেমন মানুষের জীবন চাহিদা বেড়েছে আর অন্যদিকে পেছনের লক্ষ লক্ষ বছরের তুলনায় মানুষের বংশবৃদ্ধি (অর্থাৎ জনসংখ্যা) একটু একটু করে অতি ধীর গতিতে অগ্রসর হয়েছে।[৩] প্রথম শ্রম হাতিয়ার আবিষ্কারের কয়েক লক্ষ বছর পরে মানুষ আরো শ্রম হাতিয়ার আবিষ্কার করলো, যার মধ্যে অন্যতম জীবজন্তু, পশুপাখি শিকারের শ্রম হাতিয়ার– ছুঁচালো পাথর, বর্শা-বল্লমসহ তীর-ধনুক জাতীয় শ্রম হাতিয়ার যা ব্যবহার করে মানুষ পশুপাখি শিকারসহ জীবজন্তু-পশুপাখিকে বশ মানাতে পারলো। আর সেইসাথে প্রকৃতির সংগ্রহবৃত্তিক কর্মকাণ্ড ও

[৩] বিস্তারিত দেখুন, Joel. E. Cohen. 1996. How Many People Can the Earth Support. পৃ: ৭৯-৮১, ৪০০. আদিম যুগের জনসংখ্যা নিয়ে এ পর্যন্ত কেউই এমনকি আনুমানিক তেমন হিসেব দিতে পারেন নি। তবে জোয়েল কোহেন বলছেন এখন থেকে ১০ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১ লক্ষ ২৫ হাজার; আর এখন থেকে ৩ লক্ষ বছর আগে তা ছিল ১০ লক্ষ, এখন থেকে ২৭ হাজার বছর আগে তা ছিল ৩৩ লক্ষ ৪০ হাজার। আর এখন পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা প্রায় ৮০০ কোটি।

শিকারভিত্তিক অর্থনীতি-র মিশ্ররূপ থেকে উচ্চতর পর্যায়ের শিকার ভিত্তিক ও পশুপালনভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর ঘটলো। স্থায়ী রূপ নিল উৎপাদন-ভোগ/পরিভোগ সমীকরণ, যে সমীকরণ মানুষের জীবনমান বাড়ালো, যে সমীকরণে আর যাই থাক বাজার অনুপস্থিত। মানুষের মানুষ হবার এ প্রক্রিয়ায় মানুষ পরস্পর পরস্পরের সাথে ভাব আদান-প্রদানের যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে আবিষ্কার করলো ভাষা, যা প্রাথমিক পর্যায়ে সম্ভবত ছিল বিভিন্ন বিষয় বুঝানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের হাক-ডাক-ইশারা ভাষা (যার ব্যাকরণসহ মর্মবস্তু এখনও পর্যন্ত ভাষা বিজ্ঞানীদের অজানা)। আন্তব্যক্তিক যোগাযোগ মাধ্যমের এ ভাষা মানুষকে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে দিল। এসবের অনেককাল পরে মানুষ যা আবিষ্কার করলো সেটা মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষের সম্ভবত সবচে বড় উল্লম্ফনের শক্ত ভিত্তি গড়ে দিলো– সেটা হল পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালানো, আগুন সংরক্ষণ এবং আগুনের বহুমুখী ব্যবহার। আগুন আবিষ্কার মানুষকে একদিকে জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিল আর অন্যদিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে-ঝলসিয়ে খাদ্য-খাবার খাওয়ার শর্ত সৃষ্টির ফলে মানুষের জীবনের আয়ুষ্কাল বেড়ে গেল এবং যাযাবর জীবনের অবসানসহ একই স্থানে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি হল। সভ্যতার ইতিহাসে এইই প্রথম মানুষ 'নিজেই নিজের ঠিকানা' সৃষ্টি করলো। আর এই ঠিকানা তুলনামুলক স্থায়ী হবার পরেই (তুলনামুলক স্থায়ী এজন্য যে সম্ভবত মানুষ তখনও পর্যন্ত ঘর-বাড়ি বানাতে শেখেনি পাহাড়ের গুহাতেই বাস করতো) মানুষ সম্ভবত উৎপাদন-পরিভোগ সমীকরণ কাঠামোকে অতীতের তুলনায় শক্ত ভিত্তিতে দাঁড় করাতে সক্ষম হলো। এমন শক্ত ভিত্তি যেখানে মানুষ কৃষিকাজের আগমন বার্তা পেয়ে গেলো। এই সেই নির্মোহ সত্য শ্বাশত বিবর্তনের লক্ষ লক্ষ বছরের ইতিহাস যে প্রক্রিয়ায় মানুষ নিজেই নিজেকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুললো। এ প্রক্রিয়ায় অতীতের প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে ভোগ-পরিভোগের আমূল রূপান্তর ঘটে তা প্রতিস্থাপিত হল মানুষের আবিষ্কৃত শ্রম হাতিয়ার, যোগাযোগের ভাষা আর আগুনের আবিষ্কার মধ্যস্থতাকারী উৎপাদন ও উৎপাদন ফলের সমতাভিত্তিক বণ্টন– এখানে বিনিময় (exchange) বলে কিছু নেই। তাহলে এখানে 'বাজারের' প্রসঙ্গও নেই; 'বাজার' প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। আসলে বিনিময়ের প্রসঙ্গ আরো কয়েক লক্ষ বছর পরের প্রসঙ্গ, যে প্রসঙ্গ এসেছে মানুষ যখন থেকে স্থায়ী কৃষিকাজসহ শ্রম বিভাজন (division of labour) এবং শ্রমের বিশেষায়ন (specialization) করেছে তখন থেকে। সেটাও হাজার হাজার বছরের প্রাথমিক পর্যায়ে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন এবং পরবর্তীকালে নিয়মবদ্ধভাবে। বিনিময়ের প্রসঙ্গ এসেছে তখন থেকে যখন মানুষ স্থায়ীভাবে এবং দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে এবং যখন থেকে জীবন বৈচিত্র সৃষ্টি হয়েছে। আদিম যুগে মানুষের যুথবদ্ধ জীবনকালের তুলনায় এসব সেদিনের কথা; মানব সভ্যতার ইতিহাস-কাল অনুযায়ী বেশি দিন আগের কথা নয়। আর 'বাজারের' প্রসঙ্গ এসেছে তখন থেকে যখন থেকে কম দামে কিনে বেশি দামে বেচার প্রশ্ন এসেছে অর্থাৎ যখন থেকে সম্পদ পুঞ্জিভূত করার প্রশ্ন এসেছে। আর তা এসেছে তখন যখন মানুষে মানুষে শোষণের প্রয়োজন হয়েছে। যুক্তিসঙ্গতভাবেই 'বাজার' প্রসঙ্গের শুরু মানব সভ্যতার প্রথম আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার যুগে নয়দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ আদিম সাম্যবাদী যুগে নয়, দাস যুগে। আবার 'বাজারের' এ প্রশ্নটিও চিরস্থায়ী নয়। কারণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার শেষ স্তর যৌক্তিকভাবেই মানুষে মানুষে শোষণভিত্তিক হবার কোন কারণ নেই সেটা প্রাকৃতিক বিধি অনুযায়ী উৎপাদিকা শক্তির (productive forces) বিকাশের অনিবার্যতার কারণেই অবশ্যম্ভাবিভাবেই হবে সাম্যবাদী

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। এ রূপান্তর শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার– হতে পারে তা এখন থেকে ৫০ বছর পরে অথবা ১০০ বছর পরে অথবা ১৫০ বছর পরে। এ অবস্থায় মানব সমাজ কতদিনে পৌঁছুবে তা আদৌ মুখ্য বিষয় নয়, মুখ্য বিষয় যুক্তির বিষয় যে সেটা হবে।

অর্থনীতির শাস্ত্রীয় দর্শনের বয়স বেশি নয়। বড়জোর সাড়ে ৫শ বছর (ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি ধর্মযাজক টমাস বেকন দিয়ে শুরু) যেখানে মানুষের মানুষ হবার বিবর্তন প্রক্রিয়ার শুরু কয়েক লক্ষ বছর। আবার দর্শন শাস্ত্র– শাস্ত্র হিসেবে অর্থনীতি শাস্ত্রের চেয়ে কয়েক হাজার বছর বয়জ্যৈষ্ঠ। কারণ দর্শন শাস্ত্রের কাজ (scope অর্থে) সময়ের নিগড়ে বাধা নয় তা মৌলিক, বিস্তীর্ণ এবং বহুবিস্তৃত, যেখানে অর্থশাস্ত্রের কাজ সময়ের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা এবং তা মৌলিকও নয় এবং যথেষ্ট সংকীর্ণ, ক্ষুদ্রার্থের বিজ্ঞান। সময়ের নিরিখে জগৎ, জীবন, মানব সমাজের বিবর্তন, মানুষের চেতনা ও জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ার কার্যকারণ নিরুপণে দর্শন শাস্ত্রের ক্যানভাসটা যেখানে বিশাল ও সামূহিক, সেখানে সময়ের নিরিখে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিশাস্ত্র বিজ্ঞানের রূপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে তবে দু'একটি ক্ষেত্রে (যেমন ফিজিওক্রাট, ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্র) তা বড়জোর ক্ষুদ্রার্থের বিজ্ঞান বা অনুবিজ্ঞান হবার চেষ্টা করেছে আর শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে– কার্ল মার্কসের হাতে ক্রমে তা বিজ্ঞানের রূপ নিয়েছে বলা চলে। এসব কথা বলছি এ কারণে যে যেখানে দর্শন শাস্ত্রের কাজ হলো জগৎ, জীবন, মানুষের সমাজ, তার চেতনা ও জ্ঞানের প্রক্রিয়া প্রভৃতির মৌল বিধান নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা সেখানে অর্থনীতি শাস্ত্রের কাজ (যখন থেকে অর্থনীতি শাস্ত্র তুলনামূলক নিম্নমাত্রার বিজ্ঞানের রূপ নিয়েছে) সম্পদ সৃষ্টির উৎস ও বাজার সম্পর্কিত জটিল বিষয়াদির সাধারণ সূত্রসমূহ (general laws) গড়ে তোলা। এসব কারণেই দর্শন শাস্ত্রে খোঁজ মেলে 'মহাবিজ্ঞানি' কোপার্নিকাস ও 'জ্ঞান শাস্ত্রের গৌরব' গিওর্দানো ব্রুনোর, আর অর্থনীতি শাস্ত্রে বড়জোর একজন পল স্যামুয়েলশন অথবা কেনেথ এ্যরোর। অতএব, অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতদের আজ যে বিদ্যাভিমান ও জাত্যাভিমান তা ঐতিহাসিক সময় বিবেচনায় সর্বৈব মেকি বৈ কিছু নয়। অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের বিদ্যাভিমান প্রকৃতি এমনই যে তারা (অধিকাংশই) সহজ বিষয় জটিল করতে পারদর্শী অথবা জটিল বিষয় সহজ করতে সক্ষম নন অথবা জটিল বিষয় জটিলতর করে উপস্থাপনে তাদের জুড়ি নেই। অর্থনীতির শাস্ত্রীয় পণ্ডিতেরা কথায় কথায় চাহিদা-সরবরাহের লেখচিত্র অঙ্কন করেন, আর প্রশ্ন করলে ঐ লেখচিত্রে হয় চাহিদা রেখা না হয় সরবরাহ রেখা না হয় উভয় রেখাই ডানে-বামে উপরে নিচে নিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি করেন। আর বেশি প্রশ্ন করলে সাধারণ্যে দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করে দুর্বোধ্য আঙ্কিক মডেল বিনির্মাণ করে এমনসব কথাবার্তা বলেন যার মর্মবস্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা নিজেরাও বোঝেন কিনা সন্দেহ। জিনিস দুর্বোধ্য করে তারা বাহাদুরি নিতে চায়, চায় 'জ্ঞান' ফলাতে আর আম-জনতা না বুঝে তাদের কুর্নিশ করেন। শেষ বিচারে নির্মোহ দর্শন শাস্ত্রের বিপরীতে অর্থশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনের দারিদ্র্য অনেক মাত্রায় স্বাভাবিক এবং অনেক মাত্রায় অর্থনীতিবিদদেরই সৃষ্ট।

৩। অর্থনীতি শাস্ত্রের মূল ধারাসমূহ: শাস্ত্রীয় দর্শনের দারিদ্র্যের স্বরূপ

যুগ বিভাজনে অর্থশাস্ত্রের মূল ধারাসমূহকে প্রাচীন কাল, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে বিভাজিত করা যেতে পারে। আর তারই সাথে সঙ্গতি রেখে, ধারা সংশ্লিষ্ট যেসব নাম ও মতবাদ নিয়ে আলোচনা-বিশ্লেষণ হয়ে থাকে তার মধ্যে প্রণিধানযোগ্য হল এরিস্টোটেল, প্লেটো, চীনা কনফুসিয় মতবাদ, ভারতীয় চার্বাক

দর্শন ও চানক্যের অর্থশাস্ত্র, বাণিজ্যবাদ (marcantilist), ফিজিওক্রাট ফ্রান্সুয়া কেনে, উদারপন্থী ডাড্‌লী নর্থ- ডেভিড হিউম-জন লক্, ধ্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল অর্থশাস্ত্রের উইলিয়াম পেটি-ম্যালথাস-ডেভিড রিকার্ডো-এডাম স্মিথ-জেরেমি বেন্থাম-জিন বাপ্টিস্ট সেঁই, মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রের কার্ল মার্কস, কেইনসিয় অর্থশাস্ত্রের জন মেইনার্ড কেইন্স প্রমুখ। এদের মধ্যে দু'একটি ব্যতিক্রম, যেমন সঙ্গতি বিশ্লেষক এডাম স্মিথ আর দ্বন্দ্ব সংঘাত বিশ্লেষক কার্ল মার্কস ছাড়া কেউই তেমন উচ্চতায় উঠতে সক্ষম হননি, কেউই তেমন উচ্চতায় উঠে মানব জীবনের ঐতিহাসিক বিবর্তনের নিরিখে বড় পর্দায় অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপূর্বক সাধারণ সূত্র বিনির্মাণ করতে সক্ষম হননি। বিপরীতে প্রায় প্রত্যেকেই তাদের যুগে বসে সম্পদ, বাজার, উৎপাদন-বিনিময়-বণ্টন-ভোগ সমীকরণ, রাষ্ট্র ও সরকারসহ উপরিকাঠামোর প্রতিষ্ঠান– এসবের সমসাময়িক যুগ-পর্দায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, কখনও বা তুলনামূলক সামষ্টিক– বড় পর্দায় কখনও বা ব্যক্তিক– ক্ষুদ্র পর্দায়। ফলে এদের হাতে অর্থশাস্ত্র কখনও প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানের রূপ লাভ করেনি। এমনকি মৌলকত্বের বিচারে অর্থশাস্ত্রের গুরু এডাম স্মিথ, কার্ল মাকর্স এবং জন মেইনার্ড কেইনসও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন "তাদের বক্তব্যের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কারণে নয়, বরং প্রধানত তাঁদের অর্থনৈতিক তত্ত্বের অন্তর্নিহিত সামাজিক দর্শনের জন্যই"।[৪]

সুতরাং যা আগেও একটু বলেছি সেটার কিছুটা পুনরাবৃত্তি হলেও বলতে দ্বিধা নেই যে মূলধারার অর্থনীতিবিদেরা যে সময়ে যে যুগে যে জগতের অংশ ছিলো অর্থশাস্ত্রে তারা প্রধানত সে সময়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব বিনির্মাণ করেছেন, যা যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে অসার প্রতিপন্ন হয়েছে। এটাই অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনের দারিদ্র্যের উৎস কথা।

ইতোমধ্যে (দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে) বলেছি মানুষের বিবর্তন ইতিহাস ৫০ লক্ষ বছর, আদিম সাম্যবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বয়স তারচে মাত্র একটু কিছু কম এবং তাও ৪৯ লক্ষ ৯০ হাজার বছর। কিন্তু আজ থেকে ৫০০ বছর আগেও আনুষ্ঠানিক অর্থে অর্থনীতিবিদ বলতে তেমন কারো সাক্ষাত মেলা ভার এবং তখন অর্থনীতি শাস্ত্রটা ছিল মূলত নৈতিক দর্শনের (moral philosophy) একটি শাখা মাত্র। যে শাখায় অর্থনীতি শাস্ত্রের বিবেচ্য বিষয় ছিল সম্পদ সৃষ্টির উৎস নির্ণয় থেকে শুরু করে সম্পদ বৃদ্ধির পথ-পদ্ধতি বাতলে দেয়া, এ লক্ষ্যে মুক্ত বাজার অথবা বাজারে রাষ্ট্র-সরকারের হস্তক্ষেপের পথ-পদ্ধতি-ক্ষেত্রসমূহ বাতলে দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট কর-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ঋণ, বৈদেশিক বাণিজ্য বা এধরনের বিষয়াদি নিয়ে 'sponsored' চর্চা করা। আর আধুনিক যুগে আজ এসবের সাথে যুক্ত হয়েছে উৎপাদন-বিনিময়-বণ্টন-পুনঃবণ্টন-ভোগ/পরিভোগের আন্তসম্পর্ক পুনঃউদঘাটনসহ ধনী-দরিদ্র, দারিদ্র্য-বৈষম্য, দৈব ঘটনার জগত (world of doubt and chance), বিশ্ববাণিজ্য, বিশ্ববাজার, বৈশ্বিক সম্পদ, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক মুদ্রা, বৃহদাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বৃহদাকার সরকার, বৃহদাকার ইউনিয়ন, যোগাযোগ, তথ্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ-প্রতিবেশ-জলবায়ু ইত্যাদি। এসবই সময়ের দাবি। বিজ্ঞানের পথে না মাড়িয়ে শুধুমাত্র সমসাময়িক জগতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সময় ব্যয় করে আবারও ভুল করছে অর্থনীতি শাস্ত্র। আসলে ফাঁদে পড়েছে অর্থনীতি শাস্ত্র। ফাঁদ পেতেছে এক মেরুর বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ, আর সেই ফাঁদে অর্থনীতি শাস্ত্রের সবাইকে ঢুকতে বাধ্য করছে নয়া-উদারবাদী (Neo-liberal) অর্থনীতি দর্শন (বিষয়টি পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। সুতরাং অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনের দারিদ্র্য আবারও

[৪] Daniel. R. Fusfeld. 1982. The Age of the Economist,Illinois: Scott, Foresmen and Company. p. 3।

চলতে থাকবে এবং সম্ভবত এ দারিদ্র্যের গতির হার হবে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিক। অবস্থাটা হবে অর্থনীতির ঐ বুড়ো অধ্যাপকের গল্পের মত যিনি প্রতিবছরই পরীক্ষায় ছাত্রদের একই প্রশ্ন করতেন কিন্তু উত্তরটা বদলাতে হতো।

যেহেতু এ প্রবন্ধে অর্থনীতি শাস্ত্রের চিন্তা দর্শনের ইতিহাস (History of Economic Thoughts) রচনা আমার লক্ষ্য নয় (যদিও বিষয়টি অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ববহ)– আমার লক্ষ্য ঐ দর্শনের অন্তর্নিহিত মর্মবস্তু অনুসন্ধান করে অন্তস্থিত চিন্তা 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রসঙ্গ উত্থাপন করা সেহেতু এ লক্ষ্যে অর্থনীতি শাস্ত্রের চিন্তা দর্শনের যতটুকু প্রয়োজন আমি ততটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবো। এ কাজটিও দুরূহ বটে। কথাটি বলছি এ জন্য যে, এমনকি অর্থ শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় গুরুদের অনেকেই তাদের পূর্বের এবং সমসাময়িক কালের ব্যাপক অর্থনীতি সাহিত্যের অনেক কিছুর সাথেই পরিচিত ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড তার অর্থনীতিবিদদের যুগ (The Age of the Economist) গ্রন্থের শেষে 'অধ্যয়ন ইঙ্গিত' অধ্যায়ে বলছেন "অর্থনীতি সাহিত্য যেমন ব্যাপক, তেমনই জটিল। এমন কি পেশাদার অর্থনীতিবিদদের পক্ষেও এখন আর এর সবটুকুর সাথে পরিচিত থাকা সম্ভব নয়, যদিও এক শতাব্দী আগে কার্ল মার্কসের পক্ষে সারা জীবন পড়াশুনা করার ফলে এই শাস্ত্রের যেখানে যা লেখা হয়েছিল তার প্রায় সবটাই পড়ে ফেলা সম্ভব হয়েছিল"।[৫]

অর্থনীতি শাস্ত্রের মূলধারাসমূহের শাস্ত্রীয় দর্শন চিন্তার স্বরূপ উদঘাটন করে সংশ্লিষ্ট 'দর্শনের দারিদ্র্য' বিষয়টি অনুধাবনের আগে আমি সুস্পষ্ট ১০টি বিষয় বলে রাখা জরুরি বোধ করছি। বলা চলে এসব বিষয় সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানের পদ্ধতিতাত্ত্বিক (Methodological) বিষয়। ঐ ১০টি বিষয় নিম্নরূপ: (১) অর্থনীতি যেহেতু একটি সামাজিক বিজ্ঞান সেহেতু এর ক্রমবিকাশে মতাদর্শগত বিতর্কটা স্বাভাবিক। আর মতাদর্শগত বিভিন্ন সিস্টেমের পরস্পর সম্পর্কিত সংজ্ঞা, প্রমাণাদি এবং যুক্তিসঙ্গত তত্ত্বমালা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে অর্থনীতির অনেক মূল্যবান উপাদান; (২) সামাজিক কর্মপন্থা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিতর্ক, দার্শনিক বিতর্ক থেকেই জন্ম নিয়েছে অর্থনীতি শাস্ত্রের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ টেকসই সূত্র; (৩) গোঁড়া-কুসংস্কারাচ্ছন্ন অর্থনীতির স্বীকৃত সিদ্ধান্তসমূহ আজ বিপদের সম্মুখীন; (৪) পৃথিবী নিয়ত পরিবর্তনশীল বিধায় পৃথিবীর সমস্যাগুলিও পরিবর্তনশীল আর তাই অর্থনীতির শাস্ত্রের চিন্তা দর্শন স্থির হতে পারে না; অর্থনীতি শাস্ত্রকে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে; (৫) স্বীকার করুক বা না করুক আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রের অনেকেই কোন না কোন ভুলে যাওয়া অর্থনীতিবিদদের অন্ধ ভক্ত; (৬) আধুনিক জগতে অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রভাব অন্য যে কোন শাস্ত্রের তুলনায় বেশি; (৭) অর্থনীতির তত্ত্ব আর বাস্তব জগতের সমস্যা আন্তসম্পর্কিত বিধায় মানুষ যখনই তার পছন্দের কিছু একটা বেছে নিতে চাইবে তখনই তাকে অন্য কিছু একটা ছাড় দিতে হবে– এখান থেকে শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের 'পছন্দ তত্ত্বের' উৎপত্তি (Theory of Choice)। যেহেতু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সৃষ্টি করে বেছে নেবার সুযোগ, আর পছন্দ করার সুযোগের সাথে জড়িত রাষ্ট্রীয় কর্মপন্থা সেহেতু অর্থনীতিবিদদের দাম থাকবে (মূল্য নয়) অনেক দিন; (৮) যে কোন তত্ত্বের কাজ ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যকে নিয়মবদ্ধ করা আর সমস্যার সমাধান হতে হবে বাস্তবভিত্তিক এবং সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও ভাবনার সাথে তা এমন সাযুজ্যপূর্ণ হতে হবে যা থেকে যুক্তিসঙ্গত ফল পাওয়া যায়। আর এসবের পাশাপাশি সমাজের বিবর্তনে যেহেতু উৎপাদিকা শক্তির

[৫] দেখুন, ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড (১৯৯১). অর্থনীতিবিদদের যুগ, পৃ: ২৭১ (বঙ্গানুবাদ, ড. আবদুল্লাহ ফারুক, ঢাকা: বাংলা একাডেমি)।

(productive forces) বিকাশ অনিবার্য আর এই অনিবার্যতার মধ্যে ক্রিয়া করে উৎপাদন সম্পর্ক সেহেতু যে উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির অনিবার্য বিকাশে বাঁধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে সে উৎপাদন সম্পর্ক প্রাকৃতিক নিয়মেই পাল্টে যাবে। এসব নিরিখে অর্থনীতি শাস্ত্রটা সব সময়ই রাজনৈতিক অর্থনীতি (Political Economy); অন্যান্য বিজ্ঞানের মতই অর্থনীতি শাস্ত্রের নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, যে ভাষা ধারণা সংজ্ঞায়িত করে, অনুসিদ্ধান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, সূত্র বিনির্মাণ করে এবং শেষ পর্যন্ত সাধারণ বিধি (general law) প্রতিষ্ঠা করে। এসবও পরিবর্তনশীল। অর্থনীতি শাস্ত্র এসব পরিবর্তন অনুধাবনে এখনও পর্যন্ত খুব বেশি এগুতে পারেনি বিধায় সম্পূর্ণ শাস্ত্রটাই দিশেহারা অবস্থায় নিপতিত– এখান থেকে জন্ম নেবে আগামী দিনের অর্থশাস্ত্র; এবং সর্বশেষ (১০) জীবনের সমস্যাগুলো সবসময়ই জটিল ছিল– এক্ষেত্রে সরলীকরণ হবে আত্মঘাতী; অতীতের মানুষেরা আমাদের মতই বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন ছিলেন; আমাদের তত্ত্ব তাদের চেয়ে ভাল– একথা শুধু বিতর্কিতই নয় তা হতে পারে জ্ঞান-জগতে পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ।

এখন আসা যাক মূলধারার অর্থনীতি শাস্ত্রের মর্ম কথায় এবং সংশ্লিষ্ট 'দর্শনের দারিদ্র্য' ইঙ্গিতবহ প্রসঙ্গসমূহে। উল্লেখ্য যে অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনের সারবত্তা (essence) অনুসন্ধানে ঐতিহাসিক সময়কালের নিরিখে যে সকল বিষয়সমূহের বিকাশের অন্তর্নিহিতদ্বন্দ্বঅনুধাবন করতে হবে সেগুলি হলো: সম্পদের উৎসকেন্দ্রিক (কে সম্পদ সৃষ্টি করে, কোথায় সম্পদ সৃষ্টি হয় এবং কিভাবে সম্পদ বাড়ানো যায়), উৎপাদনের উপায়ের (means of production) উপর মালিকানার ধরণ-স্বরূপ কেন্দ্রিক, উৎপাদিত দ্রব্যের সরল বিনিময় ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার কেন্দ্রিক,[৬] উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন-বিনিময়-বণ্টন-ভোগ সংশ্লিষ্ট সমীকরণ কেন্দ্রিক, উৎপাদনের উপাদান (factors of production) কেন্দ্রিক, শ্রম বিভাজন কেন্দ্রিক, উৎপাদনে বাজার-রাষ্ট্র-সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নির্ধারণ কেন্দ্রিক, সামুহিক ইকোলজিক্যাল সিস্টেমের সাথে আন্তসম্পর্ক কেন্দ্রিক, প্রভৃতি।

মানব সভ্যতার পঞ্চদশ শতকের আগে আধুনিক বাজার অর্থনীতি বলতে তেমন কিছু ছিল না। যা ছিল তা কোন অর্থেই আধুনিক পণ্য প্রথা নয়– ছিল বড়জোর সরল পণ্য উৎপাদন (simple commodity production)। সরল পণ্য উৎপাদনের শুরুটা তখন থেকে যখন থেকে শ্রম বিভাজনের (division of

---

[৬] বিষয়টি Exchange of products এবং Transformation of product into commodity সংশ্লিষ্ট। উল্লেখ্য সকল দ্রব্যই পণ্য নয়, তবে সকল পণ্যই দ্রব্য (all products are not commodities but all commodities are product)। উৎপাদিত দ্রব্য বাজারের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হলেই তা হয় পণ্য। আর তাই যুক্তিসঙ্গতভাবে মানব সমাজে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় 'দ্রব্যের' (product) ইতিহাস 'পণ্যের' (commodities) ইতিহাসের চেয়ে পুরাতন। আবার উৎপাদিত দ্রব্য যখন পণ্য নয় তখন দ্রব্য বিনিময়ের মূল উদ্দেশ্য শোষণ নয়, নেহায়েতই বিনিময়– ব্যবহারিক মূল্যের বিনিময়। আর দ্রব্য যখন বাজারের পণ্যে রূপান্তরিত হয় তখন পণ্য বিনিময়ের মূল উদ্দেশ্য 'শোষণ'। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনিময়ের এ বিষয়টি যে সহজ সমীকরণে প্রকাশ করা যেতে পারে তা হলো প্রথম ক্ষেত্রে (অর্থাৎ দ্রব্য যখন পণ্য নয়): "পণ্য– টাকা– পণ্য" অর্থাৎ নিজের শ্রমজাত পণ্য অন্যের শ্রমজাত পণ্যের সাথে বিনিময় (এখানে অর্থ পুঁজি না); আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (অর্থাৎ দ্রব্য যখন পণ্য হয়): "টাকা– পণ্য– বেশি টাকা" অর্থাৎ এখানে মূল্য আত্মপ্রসারণশীল, টাকা পণ্য ক্রয় করে আরো বেশি টাকা বানাচ্ছে, এটাই মূলধন, যা শোষণ উদ্ভূত। সমিকরণের প্রথম 'টাকা' (অর্থাৎ 'অর্থ') বিনিয়োগ হচ্ছে, অর্থাৎ বাজারে যাচ্ছে এবং বাজারে গিয়ে কিনছে 'শ্রম' অথবা 'শ্রম উদ্ভূত কোনো পণ্য' (যেমন, যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, কাঁচামাল, খাদ্যশস্য ইত্যাদি)। এ পণ্য উৎপাদন প্রথার ভিত্তিমূলে আছে দুটি বিষয় (১) শ্রম বিভাজন ও (২) শ্রমের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব। আর এই পণ্যই হলো পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক কোষ (economic cell form)-এর সৃষ্টি ঠিক তখন থেকেই যখন থেকে শ্রমশক্তিও (labour power) পণ্যে পরিণত হয়েছে– বাজারে বেচা কেনার পণ্যে।

labor) শুরু। সভ্যতার উষালগ্নে আদিম সাম্যবাদি অর্থনীতিতে শ্রম বিভাজনের কোন এক পর্যায়ে একটি জনগোষ্ঠীর উৎপাদিত দ্রব্য অন্য এক গোষ্ঠীর উৎপাদিত দ্রব্যের সাথে কেনা-বেচা হতো না– হস্তান্তরিত হত (বলা চলে বিনিময় হতো), আর একই গোষ্ঠীর উৎপাদিত দ্রব্য ঐ গোষ্ঠীর সবার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়ে যেতো। এ ধরণের গোষ্ঠী-অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপায়ের (means of production) উপর মালিকানা ছিল যৌথ অথবা সর্বজনীন। এ প্রক্রিয়ায় বিকাশের এক পর্বে যখন থেকে শ্রম বিভাগের সাথে উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ঘটলো ঠিক তখন থেকেই আসলে বাজারের লক্ষ্যে পণ্য উৎপাদন প্রথার শুরু অর্থাৎ এককথায় ব্যক্তিগত মালিকানাই পণ্য উৎপাদনের মূল ভিত্তি। সরল পণ্য উৎপাদন প্রথাটি দাস যুগের অর্থনীতি ও পরবর্তী সামন্তবাদী অর্থনীতির প্রাথমিক পর্বের জন্যও প্রযোজ্য (প্রাথমিক পর্ব বলা হচ্ছে এ জন্য যে সামন্তবাদই এক পর্যায়ে পুঁজিবাদে প্রবেশ করে)। এ দুই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় শুরুটাই ছিল কৃষক ও কারিগরদের ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপাদনের আকারে, যেখানে উৎপাদক নিজেই উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক এবং সে কারণেই নিজের উৎপন্ন দ্রব্যেরও মালিক। অর্থাৎ এ ধরনের অর্থনীতি ব্যবস্থায় নিজের শ্রমের ফল উৎপাদক নিজেই ভোগ করতে পারে। তাই সরল পণ্য উৎপাদনের ঐ পদ্ধতিতে শোষণ বলতে কিছু নেই। বাজার ভিত্তিক পণ্য উৎপাদন প্রথায় শোষণের শুরুটা তখন থেকে যখন সরল পণ্য উৎপাদনের রূপান্তর ঘটলো পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদন প্রথায় যেখানে মানুষের শ্রমই হয়ে গেলো বাজারে কেনা-বেচার পণ্য, যেখানে পণ্য উৎপাদন হয়ে গেলো সর্বজনীন ও নিয়ামক (universal and dominant system of production of commodities)। সরল পণ্য উৎপাদনে যেখানে উৎপাদনের উপায়ের মালিক উৎপাদক নিজেই এবং অর্থনীতি পরিচালিত হত মালিক-উৎপাদকের শ্রমের ভিত্তিতে সেখানে রূপান্তরিত পুঁজিতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদনের ভিত্তি হল মালিক দ্বারা শ্রমিক শোষণ (অর্থাৎ উদ্বৃত্ত শ্রমের ফসল আত্মসাৎকরণ। সুতরাং পণ্য উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট বাজার প্রথা ইতিহাসজাত বিষয়, মানব সমাজের বিবর্তনের উত্তরকালীন বিষয়, মানুষের স্বভাবজাত নয়, এবং তা সনাতনও নয়, শ্বাশতও নয়। এখানেই ধ্রুপদী অর্থনীতি শাস্ত্রের গুরু এডাম স্মিথ বড় ভুল করে ফেলেছেন যখন বলছেন "পণ্য প্রথা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে, এটা তার স্বভাবজাত"। অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনের শুরুটাই এখানে 'দর্শনের দারিদ্র্য' দিয়ে। প্রকৃত পক্ষে পণ্য প্রথা তথা বাজার ব্যবস্থা ইতিহাসের এক কালাংশে শুরু, যা আরেক কালাংশে অবলুপ্ত হতে বাধ্য। তারপরেও মানুষ থাকবে, উৎপাদন হবে, শ্রম বিভাজন উত্তরোত্তর বিকশিত হতে থাকবে, উৎপাদনের উপায় ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ শ্রম-হাতিয়ার বিকশিত হতে থাকবে। এটাই প্রকৃতির বিধান।

বাজার অর্থনীতি অর্থাৎ যে বাজারের মাধ্যমে পণ্যের দাম, উৎপাদনের পরিমাণ আর প্রত্যেকের উপার্জন নির্ধারিত হচ্ছে এমন এক পদ্ধতিতে যেখানে ব্যক্তি বিশেষের একক প্রভাব নেই, ব্যাপক অর্থের এ ব্যবস্থার উদ্ভব দেখা যাচ্ছে মধ্যযুগের শেষে মাত্র পঞ্চদশ শতকের শুরুতে। এর আগের অবস্থার বিশ্লেষণ, যা ইতোমধ্যে করেছি, তার বাস্তব রূপটি ছিল এমন যে ইউরোপের বেশির ভাগ মানুষই এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাস করতো যার সামাজিক ভিত্তিটাই ছিল এমন যেখানে অর্জন-প্রবণ মুনাফা-কেন্দ্রিক ক্রয়-বিক্রয় প্রধান অর্থনীতির বদলে প্রত্যেক মানুষের জন্য ছিল কতগুলো অধিকার আর প্রতিদানে ছিল কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন। এ পরিবর্তন-রূপান্তরটা ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রথম যার নজরে এলো তিনি ছিলেন একজন ধর্মযাজক যার নাম টমাস বেকন। টমাস বেকন ঐ যুগের জড়বাদকে তিরস্কার করে বললেন "যে সব ব্যক্তি নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফার অনুসন্ধানে লিপ্ত তারা হলেন লোভী, মেষপালক আর রাখাল স্বভাবের ভদ্রলোক"। সমসাময়িক সময়ের অর্থনৈতিক বিকাশ

ক্রমটা ছিল এ রকম: যে কৃষক সমাজ সামন্ত প্রভু জমিদারদের (manor) হাতে তাদের শ্রম ও শ্রমলব্ধ ফসল তুলে দিত (দ্রব্য খাজনা– rent in kind) তারা পরবর্তীকালে ফসল বিক্রি করে নগদ অর্থে খাজনা দেয়া শুরু করলো (অর্থাৎ দ্রব্য খাজনার রূপান্তর ঘটলো অর্থ খাজনায়– rent in cash)– প্রসারিত হতে থাকলো বাজার (market)। এ প্রক্রিয়ায় সামন্ত প্রভুদের একাংশ বাজারে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হলো যাদের হাতে ক্রমপুঞ্জিভূত হতে থাকলো সম্পদ এবং ক্ষমতা; সৃষ্টি হলো দ্বৈত অর্থনীতি– একদিকে কৃষিভিত্তিক পল্লী আর অন্যদিকে বাণিজ্য ভিত্তিক নগর; সৃষ্টি হলো নিয়ন্ত্রিত এক অর্থনীতি যেখানে ম্যানর আর গিল্ড ঠিক করতো বাজারের লেন-দেন, আদান-প্রদানের বিধিবিধান; ঠিক সমসাময়িক সময়েই ভৌগলিক আবিষ্কারসমূহ ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি করলো যা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যতে (ইউরোপে) সোনা ও রূপার আকারে বিপুল পরিমাণ মুলধন প্রবাহ সৃষ্টি করলো; জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভব বংশমর্যাদা ও গীর্জার ক্ষমতায় আঘাত হানলো; নব্য শাসকেরা যুদ্ধের নতুন কলাকৌশল রপ্ত করে প্রতিষ্ঠা করলো বেতনভুক্ত সেনাবাহিনীসহ বিশাল নৌবহর যে জন্য প্রয়োজন পড়ল বিপুল অর্থ ও উন্নত প্রশাসন; এসব চাহিদা মিটাতে সৃষ্টি হল জাতীয় কর ব্যবস্থা– সৃষ্টি হল বাজার ব্যবস্থার নবতর রূপ আর নয়া অর্থনৈতিক এ ব্যবস্থার ফলে 'অর্থনীতি' নামক একটি শাস্ত্রেরও উদ্ভব ঘটলো, যেখানে ধর্মযাজকরাই ছিলেন 'অর্থনীতিবিদদের' প্রথম দল।

অর্থনীতিবিদদের প্রথম দল ধর্মযাজকদের চিন্তা-ভাবনার মূল বিষয় ছিল কিভাবে অর্থনৈতিক জীবনের নৈতিক ভিত্তিকে পুনর্গঠন করা যায়। অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রথম দল এসব ধর্মযাজকেরা বলতে থাকলেন পৃথিবীর জীবনটা চিরস্থায়ী পরলৌকিক জীবনের প্রারম্ভিকা মাত্র, আর মানুষের সকল উদ্যোগ-আচরণেই নৈতিকতার বিধিবিধানকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া উচিত; তাঁরা বললেন মোক্ষপ্রাপ্তিই জীবনের মূল কাজ; তাঁরা এও বললেন যে অর্থের কারণেই অর্থ কামনা করাটা পাপ। কিন্তু গোঁড়া ধর্মযাজকদের এসব কথা মুনাফা-ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থার সাথে ক্রমান্বয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ালো। ধাঁধাঁয় পড়লো মানুষ, আর জন্মসূত্রেই ধাঁধাঁয় পড়লো অর্থনীতি শাস্ত্র। একদিকে ধর্মের নীতিশাস্ত্রীয়শিক্ষা যে প্রত্যেকেই নৈতিক দিকে থেকে একে অপরের কাছে দায়বদ্ধ অর্থাৎ ভ্রাতৃভাব, আর অন্যদিকে বাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকার জন্য একে অপরকে টেক্কা দেবার প্রয়োজনীয়তা, একে অপরকে পিছনে ফেলার প্রচেষ্টা অর্থাৎ প্রতিযোগিতা। মোক্ষলাভ ও পার্থিব সাফল্যের নৈতিক এ দ্বন্দ্ব থেকে উৎপত্তি ষোড়শ শতকের ইউরোপে পোপ বিরোধী খ্রীষ্টিয় ধর্ম বিপ্লব বা রিফরমেশন। এদের যুক্তি "মোক্ষলাভ হবে নিজের পেশায় কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে, পেশা যেটাই হোক না কেন। পেশা ঈশ্বর প্রদত্ত"। তাদের মূল বক্তব্য হল এরকম "ব্যবসায়ীরা ঈশ্বর সৃষ্ট এবং তারা ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষের সাথে ঈশ্বরের মধ্যস্থতাকারী মাত্র", আর এ বক্তব্য দিয়ে তাঁরা এমন ধরনের অর্থনৈতিক নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করলো যা মুনাফাভিত্তিক বাজার অর্থনীতিকে নৈতিক সমর্থন যোগালো। নব্য অর্থনৈতিক এই নীতিশাস্ত্র একদিকে বলেছে মানুষের উচিত অপর মানুষের সম্পর্কে কর্তব্যজ্ঞান-সম্পন্ন হতে হবে আর অন্যদিকে বলেছে বাজার অর্থনীতির "খদ্দের সাবধান" নীতির আওতায় প্রতিযোগিতার আইনের অনুশাসন মেনে চলতে হবে– এসব বলে নতুন এক নৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। এখান থেকেই শুরু অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় 'দর্শনের দারিদ্র্য'।

অর্থনীতি শাস্ত্রের ইতিহাসে মার্কেন্টাইলিস্ট (mercantilist) বা বণিকতন্ত্রী বা বাণিজ্যবাদীরাই ছিল প্রথম মূলধারা। ষোড়শ আর সপ্তদশ শতকে গড়ে ওঠা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের (Nation States) অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি আর সেই সাথে অষ্টাদশ শতকের বিতর্ক চূড়ান্ত বিবেচনায় জাতীয় সম্পদের (national wealth) উৎস কি? এসবই ছিল তাদের চিন্তা-ভাবনার মূল বিষয়াদি। তখন জাতীয় সম্পদের উৎস সংশ্লিষ্ট বিতর্কে কেউ মনে করতেন সেটা হচ্ছে ব্যবসা, কেউ বলতেন কৃষি এবং

প্রকৃতি, আবারো কেউ মনে করতেন মানুষের শ্রম। বিতর্কটা গুরুত্বহ ছিল এ কারণে যে এ প্রশ্নের উত্তরের উপরই নির্ভর করত সরকারের বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক নীতি (economic policy) নির্ধারণ। অভ্যন্তরীণ সমস্যাটি ছিল প্রধানত মধ্যযুগের স্থানীয় ভিত্তিক সমাজ থেকে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে ঐক্য প্রতিষ্টা সংশ্লিষ্ট। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এর অর্থ সারা দেশের জন্য একক মুদ্রা ব্যবস্থা, একক ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি, সারা দেশে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন টোল-শুল্কের বিপরীতে একক কর ও শুল্ক ব্যবস্থার প্রবর্তন। এ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সামন্তপ্রভুদের সাথে জাতীয় শাসক রাজ-রাজরাদেরদ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল অনিবার্য। আর এই দ্বন্দ্ব সংঘাতে উভয় পক্ষেরই প্রয়োজন ছিল স্ব-স্ব পক্ষীয় মিত্রবাহিনী। অর্থাৎ দু'ধারার অর্থনীতিবিদ। এদের মধ্যে ঐক্যকামী জাতীয় শাসক–রাজ-রাজরাদের পক্ষটাই ছিলো পাল্লায় ভারী, আর পাল্লা ভারি করতেই মার্কেনটাইলিস্টদের উদ্ভব। রাজ-রাজরারা জাতি রাষ্ট্র গঠনে মিত্র হিসেবে যাদের পেলেন তারা হলেন নগরের উদীয়মান বণিকশ্রেণি, ক্ষুদ্র ভূমিমালিক শ্রেণি, উকিল শ্রেণি এবং সরকারি আমলা ও কোর্ট। এ মৈত্রি ছিল সমস্বার্থের ঐক্য। কারণ, বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ বণিক সম্প্রদায়ের কাজ যে বণিকেরা রাজার সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়ক; ক্ষুদ্র ভূমি মালিক শ্রেণি রাজার মধ্যে দেখতে পেলো স্থানীয় জমিদার-ব্যারনদের শক্তি কাবু করার পথ; নতুন নতুন জটিল শর্তাবলী জুড়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে প্রয়োজন ছিল উকিলদের; আর সরকারি আমলা-প্রশাসন ও কোর্ট ছিলো এসবের কৌশলগত অংশিদার 'ভদ্রলোক শ্রেণি'। সুতরাং রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজনেই রাজশক্তি, বণিকশক্তি, ভদ্রলোক আর বুদ্ধিজীবীদের প্রয়োজন অনিবার্য ছিল। তা অনিবার্য ছিল সমগ্রজাতিকে একজন শক্তিমান শাসকের অধীনে একত্রিত করার স্বার্থে। আর এসব কারণেই প্রয়োজন দেখা দিল শক্তিশালী সামরিক ও নৌশক্তির এবং উৎপাদন ও বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করার অর্থনৈতিক নীতিমালা। এসব বাস্তবায়নে যারা যুক্তি-তর্ক হাজির করলেন তারাই আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রথম সংঘবদ্ধ চিন্তাবিদ– মার্কেনটাইলিস্ট। এই মার্কেনটাইলিস্টরাই প্রথম বললেন জাতিসমূহের সম্পদের উৎস হল 'বাণিজ্য'– কৃষি, শিল্প, বা শ্রম নয়। সুতরাং বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রয়োজনে যুদ্ধ করে অন্যের দেশ দখল করা অনৈতিক নয় বলে রাজাদের ফর্দ দিলেন "যুদ্ধ ভাল, যদি যুদ্ধে জেতা যায়"; তারাই বললেন (ড্যানিয়েল ডিফোর থেকে ধার করে) বৈদেশিক বাণিজ্য উৎসাহিত করতে উপনিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা; বাণিজ্য সম্প্রসারণে সরকার কর্তৃক বণিকদের সকল ধরনের প্রণোদনার কথা বললেন; তারাই ফর্দ দিলেন নিরঙ্কুশ সংরক্ষণবাদী নীতি (absolute protectionism) গ্রহণের পক্ষে; মজুরি কম রাখার পরামর্শ দিলেন; স্ব-বাণিজ্যিক স্বার্থ উৎসাহিত করতে পরামর্শ দিলেন সংরক্ষণমূলক শুল্কব্যবস্থা ও নেভিগেশন আইন প্রণয়নের; মুদ্রা বিষয়ক নীতি (money policy)-তে তাঁরা চাইলেন 'সহজ মুদ্রা নীতি' (easy money policy) অর্থাৎ মুদ্রা সরবরাহ যথেষ্ট থাকবে যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য উৎসাহিত হয় এবং সুদের হার কম থাকে; মুদ্রাস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা বললেন সঙ্গত কারণেই এবং সেইসাথে যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন বাণিজ্যিক ভারসাম্য দেশের অনুকুলে রাখতে হবে– এই ছিলো মার্কেন্টাইলিস্টদের মৌলিক মতবাদ। অর্থনীতি শাস্ত্রে মার্কেন্টাইলিস্টদের এসব চিন্তাধারার প্রতিটি উপাদানই ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকে জাতি রাষ্ট্র গঠনে ঐক্য সৃষ্টিসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চরম বৈষম্যাবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণিত। অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় বিজ্ঞান আর মতবাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উভয় দিক থেকেই মার্কেন্টাইলইজম ইংল্যান্ড, ফ্রান্সসহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশের অর্থনৈতিক গতি বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু শাস্ত্রীয় দর্শন হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শনকে যেভাবে স্থানিক রূপ দিয়েছে তা তাদের 'দর্শনের দারিদ্র্যে'র সুস্পষ্ট প্রতিফলন। মার্কেন্টাইলিজমের যে আগ্রাসী সংরক্ষণবাদী নীতি অবলম্বণে ইংল্যান্ড, ফ্রান্সসহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশ সমসাময়িককালে উন্নতি করেছে আজকের যুগে ঐ ইংল্যান্ড-ফ্রান্সসহ ইউরোপের প্রায়

সকল শক্তি আমাদের উন্নয়নশীল বিশ্বকে অথবা উন্নয়নকামী বিশ্বকে বলছে যাই করো সংরক্ষণবাদী নীতি গ্রহণ করতে পারবে না, বলছে উদার হও, অর্থনীতিকে উদারীকৃত কর। এ শুধু মার্কেন্টাইলইজমের অন্তস্থিত দারিদ্র্য নয়, এ এক বিষম স্ববিরোধ!

মার্কেন্টাইলইজম যখন বাজার অর্থনীতির কিছু কিছু অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষতি করতে লাগলো তখনই হলো প্রতিবাদ। আর প্রতিবাদ থেকে জন্ম নিল অর্থশাস্ত্রের নতুন মতবাদ। প্রতিবাদকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিল কৃষক, শিল্প উৎপাদক ও ছোট ব্যবসায়ী (বড় ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া ব্যবসার জ্বালা-যন্ত্রণায়)। কৃষকরা দেখলেন রাজপুরুষরা করমুক্ত কিন্তু যাবতীয় কর আদায় করা হচ্ছে ক্ষুদে কৃষক আর স্বনির্ভর কৃষিজীবীদের থেকে; শিল্প উৎপাদনকারীরা দেখলেন যে যা কিছু সুবিধে সবই যাচ্ছে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারণ-সম্প্রসারণে; সাধারণ জনগণ দেখলেন সরকার দুর্নীতি পরায়ণ-অযোগ্য; আর উপনিবেশের মানুষ দেখলেন যে সৈন্যদল ইংরেজ-ফরাসি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণে হেন অন্যায় নেই যা করছে না অথচ আমাদের তাদেরকেই পুষতে হচ্ছে তখন মার্কেন্টাইলইজমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আস্তে আস্তে প্রতিরোধের শক্তিতে রূপান্তরিত হল। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে ক্ষুদ্র কৃষক কর-শুল্কের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল; ইংরেজদের মার্কিন উপনিবেশে "প্রতিনিধিত্ব ছাড়া ট্যাক্স না দেয়ার দাবি" উঠল; ভারতে উপনিবেশ বিরোধী শক্তি দানা বাঁধতে থাকলো; আমেরিকায় শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী ও উপনিবেশ-বিরোধী আমেরিকান বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেলো; এমনকি ইউরোপেও অর্থনৈতিক প্রশ্নে বিতর্ক জোরদার হলো। শেষ পর্যন্ত মার্কেন্টাইলইজমের যুগের পরিণতি এমনই খারাপ হলো যখন ভ্যাঁসো দ্য গুরনে (১৭১২-১৭৫৯) নামক সরকারের একজন ট্রেডমার্ক ইনসপেক্টর মার্কেন্টাইল নিয়ন্ত্রণ বিধির বিরুদ্ধে মোহভঙ্গ হয়ে বললেন 'লেজে ফেরে', 'লেজে পাসে' (laissez faire, laissez passer) অর্থাৎ 'মুক্ত কর্ম প্রচেষ্টা', 'মুক্ত বাণিজ্য'। অবশ্য এ হলো মোহভঙ্গ বাণী। এ বাণীও পরবর্তীকালে দেখা যাবে একদিকে যেমন মুক্তির বাণী নয়, অন্যদিকে এ বাণীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতি শাস্ত্রের দর্শনকে 'দর্শনের দারিদ্র্য' থেকে মুক্ত করতে আদৌ সক্ষম হয়নি।

ফ্রান্সে মার্কেন্টাইলইজমের বিরোধীরা ফিজিওক্রাট (Physiocrat) খ্যাত। অর্থনীতি শাস্ত্রের বিকাশে ফিজিওক্রাটদের অবস্থান অন্য অনেকের চেয়ে সত্যনিষ্ঠ। এদের প্রধান ফ্রাঁসোয়া কেনে্ (Francois Quesney, ১৬৯৪-১৭৭৪) পেশায় চিকিৎসক এবং রাজা পঞ্চদশ লুই এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক। তিনি ফরাসি দেশে কৃষকদের ১৫০-২০০ বছরের স্থবিরতার কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করে ফেললেন সম্পদের উৎস শিল্প বা বাণিজ্যে নয়, সম্পদের উৎস কৃষি। তার মতটি এরকম: প্রকৃতির জীবনদানকারী সামগ্রী হিসাবে একমাত্র কৃষিই উৎপাদনে নিয়োজিত মানব প্রচেষ্টার ফলে উদ্বৃত্ত(surplus) সৃষ্টি করতে সক্ষম। অর্থনীতিতে উৎপাদন-পুনরুৎপাদন সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে চিকিৎসা শাস্ত্রের আবিষ্কার মানবদেহের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার নিরিখে দেখে তিনি ১৭৫৮ সালে আবিষ্কার করলেন 'ইকনমিক টেবিল' (Tableũ Economique)। যা অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রথম "ম্যাক্রোইকনমিক টেবিল" অথবা প্রথম "ম্যাক্রোইকনমিক মডেল" নামে স্বীকৃত। যেখানে তিনি দেখালেন, কিভাবে কৃষি থেকে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে খাজনা (rent), মজুরি এবং বেচাকেনার মাধ্যমে তার গতিপথে সকল শ্রেণির মানুষেরই ভরণপোষণ জোগায়। কেনে্র বিশ্লেষণ ভূস্বামী-ভিত্তিক রাজতন্ত্রকে চরম আঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়াল যখন তিনি বললেন যে প্রকৃত উৎপাদক শ্রেণি– কৃষককুলের স্থবিরতার মূলে আছে ভূস্বামী-জমিদার যারা প্রকৃত অর্থে পরজীবী, আর তাই ফ্রান্সের উন্নতি চাইলে মধ্যস্বত্বভোগীসহ পরজীবী ভূস্বামীদের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করতে হবে (কৃষকের উপর নয়), কারণ উদ্বৃত্ত সৃষ্টিকারী কৃষকদের উদ্বৃত্তঐ ভূ-স্বামীরা বিলাস জীবন যাপনে ব্যয় করে আয়ের উৎপাদনশীল

চলাচল ব্যাহত করছে। শেষমেশ চাকুরি হারালেন ফ্রাঁন্সুয়া কেন্নে। কেন্নের পাশাপাশি জ্যাকস তুরগো (১৭২৭-১৭৮১) ছিলেন আরেকজন ফিজিওক্রাট যিনি অর্থমন্ত্রী হয়ে রাজার সমর্থনে সামন্ততন্ত্র বিরোধী এবং মার্কেন্টাইললিজম বিরোধী সংস্কার কার্যক্রমে হাত দেন– কিন্তু সম্ভ্রান্ত সামন্তদের বিরোধিতার মুখে পদত্যাগে বাধ্য হন। কয়েক বছর পরেই আবার ঐ সরকারকেও দূর করে দেয়া হয়। ফ্রাঁন্সোয়া কেন্নে, জ্যাকস্ তুরগোসহ ফিজিওক্রাটদের সকলেই একটি মৌলিক প্রশ্নে একমত হন যে সকল সম্পদই শেষ পর্যন্ত জমি থেকে আসে। শিল্প শুধুমাত্র প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের আকার পরিবর্তন করতে পারে আর বাণিজ্য পারে শুধুমাত্র তার অবস্থান ও মালিকানা পরিবর্তন করতে। একমাত্র জমিই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে এবং এটা ছিল সম্পদের উৎস সম্পর্কেদ্বিতীয় প্রধান তত্ত্ব। ফিজিওক্রাটদের এ তত্ত্বের প্রধান ভ্রান্তি যেখানে তা হল কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য নির্বিশেষে সকল খাত-ক্ষেত্রেই যে উদ্বৃত্তসৃষ্টি হয় এবং সে উদ্বৃত্তবণ্টিত হয় মালিক শ্রেণির মধ্যে– এ সত্যকে দেখতে না পারা। সম্ভবত এটিই ছিল অর্থনীতি শাস্ত্রের অন্যতম মূলধারা ফিজিওক্রাটদের চিন্তা-ভাবনার প্রধান সীমাবদ্ধতা, আর এ সীমাবদ্ধতা থেকেই উদ্ভূত তাদের 'দর্শনের দারিদ্র্য'।

অর্থনীতি শাস্ত্রে ফিজিওক্রাটদের প্রভাব টিকে ছিল বহুদিন, কিন্তু তাদের যুগটা ছিল ক্ষণস্থায়ী। ফিজিওক্রাটদের পাশাপাশি মোটামুটি একই সময়ে আবির্ভুত হয় অর্থনীতি শাস্ত্রের উদারপন্থী (Liberalism) দল। সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের শুরুর দিকে পা পা হাঁটি হাঁটি করে উনবিংশ শতকে এই মতবাদটা হয়ে দাঁড়ালো অর্থনীতি শাস্ত্রের চিন্তা জগতের প্রধান স্রোতধারা যা আজও চিরায়ত বা ধ্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল রাজনৈতিক অর্থনীতি (Classical Political Economy) হিসেবে পরিচিত। ধ্রুপদী অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রথম যুগের অর্থনীতিবিদেরা প্রথমেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণগুলোকে আক্রমণ করে শুল্ক, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট বিধি নিষেধ উঠিয়ে দেবার পরামর্শ দিল। তাদের যুক্তির মূল ভিত্তি হল "ব্যক্তিগত প্রেরণার ফল সবার জন্যই মঙ্গলজনক"। ইংল্যান্ডে এ ধারার প্রথম দিকের প্রবক্তা ডাড্‌লি নর্থ (১৬৪১-১৬৯১) তার "Discourse upon Trade"-এ জোরালো যুক্তি দিলেন যে বাণিজ্য হতে হবে অবাধ (মুক্ত বাণিজ্য)। কারণ বাণিজ্যে উভয় পক্ষেরই সুবিধে হয়, এতে পারদর্শিতা বাড়ে, শ্রম-বিভাজন উন্নততর হয় ফলে সম্পদ বাড়ে। আর এসবের বিপরীতে মার্কেন্টাইলিস্টদের সমালোচনা করে ডাড্‌লি নর্থ বললেন যে নিয়ন্ত্রণ– বাণিজ্য হ্রাস ও সীমাবদ্ধ করে ফলে উল্লিখিত সকল সুবিধে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং প্রকৃত সম্পদ হ্রাস পায়। ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) ১৭৫২ সনে নর্থের যুক্তি সমর্থন করে দেখালেন যে স্বয়ংক্রিয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোন পক্ষেরই বাণিজ্যের ভারসাম্য থাকতে পারে না। ডাড্‌লি নর্থেরও কিছু আগে ইংল্যান্ডে দেশান্তরী এক ডাচ চিকিৎসক বানার্ড দ্য ম্যোন্ডেভেইল (১৬৭০-১৭৩৩) ১৭১৪ সালে 'মৌমাছিদের গল্প' (The Fable of the Bees) শীর্ষক জনপ্রিয় এবং বিতর্কিত ছন্দহীন কবিতার ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করলেন (যার প্রচার সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়)। ম্যোন্ডেভেইলের কবিতাটির প্রধান যুক্তি হল এ রকম: সভ্যতার উন্নতি হচ্ছে পাপ কাজের ফল, পুণ্যের নয়। ব্যক্তির নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার ফলেই উন্নয়ন আসে, যেমন আরাম ও আয়াসের ইচ্ছে থেকে, বিলাস আর আনন্দ থেকে। কঠিন পরিশ্রম করার বা সঞ্চয় করার বা অপরের মঙ্গল করার ইচ্ছা থেকে নয়। ব্যক্তির স্বার্থপরতার প্রেরণাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে সৌভাগ্য আর অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। স্বার্থপরতার পাপ মানুষকে তার লাভটা সর্বোচ্চ পরিমাণে তুলতে উৎসাহিত করবে এবং এইভাবেই তা জাতির সম্পদ বৃদ্ধি করবে। এইভাবে পাপ প্রতিপালন করে উদ্ভাবনী দক্ষতাকে, তার সাথে যদি সময় আর শিল্পজুড়ে দেয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে, জীবনের যত সুবিধে, আসল স্ফূর্তি, আরাম আর আমোদ, এত বেশি অর্জিত হবে যে দরিদ্রেরাও

আগের দিনের ধনীদের চেয়ে ভালভাবে বাঁচবে, তাতে যোগ করার মত আর কিছুই বাকি থাকবে না। ম্যোন্ডেভেইলের এসব কথাবার্তা যথেষ্ট স্পষ্ট এবং মারাত্মক। আর মারাত্মক এসব কথাবার্তা যতই অপ্রিয় হোক বা অশোভনীয় হোক আসলে এসবই হয়ে দাঁড়ালো মুক্তবাজার সমর্থনকারী অর্থনীতি শাস্ত্র– ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের অন্যতম মৌল ভিত্তি। এর পরেও উদারবাদী অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় চিন্তা-ভাবনার 'দর্শনের দারিদ্র্যে'র আর অবশিষ্ট কি থাকতে পারে?

অষ্টাদশ শতকের উদারপন্থী অর্থনীতিবিদেরা কৃষি বা ব্যবসা কোনটাকেই সম্পদের উৎস মনে করতেন না, তাদের মতে মানুষের শ্রমই সম্পদ সৃষ্টি করে। তারা বলতেন প্রাকৃতিক উৎপন্ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম নয়, এ সক্ষমতা অর্জন করতে হলে প্রাকৃতিক উৎপন্নকে মানুষের শ্রম দিয়ে পরিবর্তিত-রূপান্তরিত করতে হবে; উৎপাদনমূলক শ্রম ছাড়া প্রাকৃতিক সামগ্রীর মূল্য নেই। এই মতবাদকে "মূল্যের শ্রম তত্ত্ব" (Labor Theory of Value) বলা হয়। ইংরেজ দার্শনিক জন লক্ (১৬৩২-১৭০৪) শ্রম আর সম্পদের উৎপাদন বিষয়ক ধারণার সাথে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে যুক্ত করে সম্পত্তির অধিকারকে উদারপন্থী মতবাদের অন্যতম প্রধান ভিত্তিতে রূপান্তরিত করেন। পরবর্তী সময়ের উদারপন্থীরা শ্রম, সম্পদ এবং সম্পত্তি নিয়ে আরো অগ্রসর হয়ে বললেন 'ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে নিরাপদ করতে হবে অন্যথায় কাজে আগ্রহ কমে যাবে এবং তার ফলে সম্পদের উৎপাদন কমে যাবে'।

আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা অথবা ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি শাস্ত্রের জনক হলেন এডাম স্মিথ (১৭২০-১৭৯০)। ১৭৭৬ সনে প্রকাশিত হয় তার ধ্রুপদী গ্রন্থ "An Inquiry in to the Nature and Causes of Wealth of Nations" (যা সর্বজনে Wealth of Nations নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ)। স্মিথের 'বাজারের অদৃশ্য হাত' (invisible hand of market)-এর নাম শোনেনি এমন শিক্ষিতজন নেই বললেই চলে। এডাম স্মিথ এক ধরনের 'প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ভিত্তিক ব্যবস্থায়' (System of natural liberty) বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বাসমতে প্রত্যেক মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ দিলে তা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই সর্বোত্তম পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব হবে। তার মতে এই সহজ সূত্রের ভিত্তিতেই একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবস্থাতেও সামাজিক শৃংখলা-সংহতি গড়ে উঠবে। এডাম স্মিথের এ ধারণার সাথে ১৭০৪ সালে "মৌমাছিদের গল্প" রচয়িতা ম্যোন্ডেভেইলের মারাত্মক অনৈতিক ও অশোভনিয় বক্তব্য "সভ্যতার উন্নতি মানুষের পাপ কাজের ফল, পূণ্যের নয়"-এর পার্থক্য কোথায়? এডাম স্মিথ বলছেন "আমরা যে আমাদের খাবার আশা করি, সেটা কসাই, শৌন্ডিক বা রুটিওয়ালার দয়ার উপর নির্ভর করে নয়, বরং তাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনেই এটার সরবরাহ হবে। আমরা তাদের স্বার্থের সাথেই কথা বলি, তাদের মহানুভবতার সাথে নয়, আর আমাদের কি দরকার সেটা তাদের সাথে আলোচনা করি না বরং তাদের সুবিধাটাই আলাপের বিষয়বস্তু"। স্মিথের মতে সরকারই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান বাধা। তবে সরকারকে স্মিথ কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে চান তা স্পষ্ট নয়। স্মিথ একদিকে বলছেন যে 'এক অদৃশ্য হাত' বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে উন্নতি নিশ্চিত করবে আবার ব্যবসায়িদের মধ্যে যে জনস্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রবণতা আছে সে বিষয়েও তিনি সচেতন তাই বলছেন "একই ব্যবসার লোকদের কদাচিৎ দেখা সাক্ষাত হয়। এমন কি আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষেও নয়, কিন্তু দৈবাৎ যখনই তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়, তার উপসংহারে হয় জনসাধারণের বিপক্ষে কোন ষড়যন্ত্র, না হয় জিনিসের দাম বাড়ানোর কূটকৌশল থাকবেই"। স্মিথের একথাটি যদি ঠিক হয় সেক্ষেত্রে তার "স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার" তত্ত্বের কি হবে? অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় ভাবনার ভাবনা গুরু এডাম স্মিথের 'দর্শনের দারিদ্র্য' একাধিক ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এসবের বহিঃপ্রকাশের

কয়েকটি নিম্নরূপ, (১) যা দিয়ে সর্বতোভাবে এবং প্রকৃতই সব সময় সমস্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয় তা যে 'শ্রম' সে কথা প্রমাণে এডাম স্মিথ বলেছেন "শ্রমের সমান সমান পরিমাণের মূল্য শ্রমিকের কাছে সর্বকালে এবং সর্বস্থানে একই হতে বাধ্য। তার স্বাস্থ্যের, শক্তির এবং কর্মের স্বাভাবিক অবস্থায়, এবং তার যে গড়পড়তা কর্মকুশলতা আছে তাতে সে সর্বদাই তার বিশ্রামের, স্বাধীনতার এবং সুখের নির্দিষ্ট এক অংশ ত্যাগ করতে বাধ্য" (Wealth of Nations, V.1, ch. V)। একদিকে, এ ক্ষেত্রে (সর্বত্র নয়) এডাম স্মিথ পণ্য উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হয় তা দ্বারা মূল্য নির্ধারণের সাথে শ্রমের মূল্য দ্বারা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ গুলিয়ে ফেলেছেন, এবং তাঁর ফলে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সমপরিমাণ শ্রমের মূল্য সর্বদাই সমান। অপরদিকে, তাঁর এই রকম একটা আন্দাজ আছে যে শ্রম যে হিসেবে পণ্যের মূল্যের ভিতর প্রকাশিত হয় সেই হিসেবে তা কেবল শ্রমশক্তি ব্যয় বলে পরিগণিত, কিন্তু তিনি এই ব্যয়কে কেবল স্বাভাবিক কাজকর্ম হিসেবে নয়। কিন্তু তাঁর চোখের সম্মুখে হয়েছে আধুনিক মজুরী-শ্রমিক।[৭] (২) 'কার্যকর চাহিদার' প্রকৃতি এবং আয় বণ্টনের ধরনের উপর এর নির্ভরশীলতা বিষয়ক স্মিথের ধারণার সীমাবদ্ধতা অনেক। তার মতে 'উৎপাদন খরিদ্দারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যাবে'। কিন্তু আসলে যা ঘটে তা হল: আয়ের বণ্টন যদি অত্যন্ত অসম হয়, তবে ঐ ব্যবস্থায় ধনী বেশি পাবে আর দরিদ্রের জন্য থাকবে সামান্য। (৩) স্মিথ– সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাটা একাধারে প্রাকৃতিক এবং প্রয়োজনীয় মনে করতেন এবং ঐ ব্যবস্থার সমর্থন করতেন। খাজনা আর মুনাফা স্পষ্টতই মানুষের শ্রমের ফল– নিজের স্বার্থের প্রেরণার মত কোন প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। এটা স্মিথের বাজারকেন্দ্রিক প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ভারসাম্যের ধারণাটিকেই অযৌক্তিক করে দেয়। (৪) এসবের পাশাপাশি এডাম স্মিথের ধ্রুপদী অর্থনীতি দর্শনের অন্যতম ভ্রান্তিকে বলা হয়– "এডামের বিভ্রান্তি" বা "এডামের ভ্রান্ত যুক্তি" (Adams Fallacy)। বিষয়টি এরকম: এডাম স্মিথের আগে অর্থনীতি শাস্ত্র যখন সার্বভৌম সরকারদের বুদ্ধি পরামর্শ দিত যে কিভাবে সরকারি নীতিকৌশল বিশেষত সরকারি আর্থিক নীতি বিনির্মাণ করে বাজারের সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা সরকারের পক্ষে বাড়ানো যায় সেখানে স্মিথ অর্থনীতিবিদদের এ ভাবনা-ক্ষেত্র প্রসারিত করলেন। এ প্রক্রিয়ায় তিনি ভাবলেন সমাজ কিভাবে আরো বেশি ফলপ্রদ আরো বেশি উৎপাদনশীল হতে পারে, এবং সেক্ষেত্রে বাজারসহ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যক্তি জীবনের সম্পর্কটা কেমন হতে হবে। এবং তিনি বললেন, আধুনিক সমাজ বৃহৎ দুটি বর্গে বিভক্ত যার মধ্যে সংহতি হতে হবে। প্রথম বর্গ হল ব্যক্তি জীবন, আর দ্বিতীয় বর্গ হলো সমাজ জীবন। তিনি বললেন: অর্থনৈতিক জীবনে ব্যক্তির উদ্যোগ ও পারস্পরিক যোগসূত্র ব্যক্তি-নির্ভরহীন সূত্র দিয়ে পরিচালিত হয় যা ব্যক্তির নিজস্বার্থ বা স্ব-স্বার্থের জন্য উপকারী; আর ব্যক্তির স্ব-স্বার্থ কেন্দ্রিকতার বাইরে আছে রাজনীতি, ধর্ম এবং নীতি-নৈতিকতাসহ সমাজ জীবন। তার মূল কথা হল ব্যক্তির স্ব-স্বার্থের সাথে সামাজিক জীবনের সংহতি হতে হবে– আর এ সংহতি সাধনের একমাত্র মাধ্যম হলো ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ নিমিত্ত 'বাজারের অদৃশ্য হাত' (মুক্ত বাজার)। এক্ষেত্রে স্মিথের যুক্তিগত ভ্রান্তি (Adams Fallacy) হলো তার স্ব-বিরোধী বক্তব্য যে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি এমন একটি সিস্টেম যেখানে ব্যক্তির স্বার্থপরতা অন্য সবার মঙ্গল বয়ে আনে। এখানে স্মিথের অবস্থানের "নৈতিক ভ্রান্তি" (moral fallacy) হলো "বিমূর্ত ভাল" (abstract good) কোনো কিছু পাবার আশায় আমাদেরকে মূর্ত ও প্রত্যক্ষ (concrete and direct) মন্দ বা

[৭] পণ্যের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কিত এডাম স্মিথের এ সমালোচনা করেছেন কার্ল মার্কস (দেখুন, কার্ল মার্কস, ১৯৮৮, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ: ৭১)।

শয়তানকে বেছে নিতে বলছেন; "যুক্তিগত ভ্রান্তি" (logical fallacy) হলো স্মিথসহ কেউই এ পর্যন্ত প্রমাণ করতে সক্ষম হননি যে কিভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা সমষ্টির জন্য ভাল হয়; আর "মনস্তাত্ত্বিক ব্যর্থতা" (psychological failure) হলো স্মিথের যুক্তি মেনে নিলে পুঁজিবাদের উন্নয়ন ফল হিসেবে বৈষম্য থেকে শুরু করে কমজোরি সবার উপর পুঁজিবাদের ঋণাত্মক প্রভাব-অভিঘাত মেনে নিতে হয়।[৮]

এডাম স্মিথের মতই ধ্রুপদী রাজনৈতিক-অর্থনীতি শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩)। মূলধন সঞ্চয়ের প্রবক্তা রিকার্ডোর মতে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের সবচেয়ে বড় উৎস হলো মূলধনের প্রবৃদ্ধি, এবং সকল অর্থনৈতিক কর্মপন্থা সেই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হওয়া উচিত। এই মত প্রমাণের জন্য তিনি অর্থনীতির এক তাত্ত্বিক মডেল প্রণয়ন করেন যা পরবর্তী ৫০ বছর অর্থনীতিবিদদের চিন্তা জগতে মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। রিকার্ডোর মডেলে বলা হল– যদি অর্থনীতিকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া হয় তবে সেটা একদিন সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। তবে রিকার্ডোর মতে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ব্যবসাকে সকল রকম নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে যাতে মুনাফা সর্বোচ্চ হয়, আর সর্বোচ্চ সঞ্চয় এবং পুঁজি সংগঠন সম্ভব হয়। স্মিথের মতই রিকার্ডোর বিশ্বাস– সরকারি হস্তক্ষেপ উৎপাদন হ্রাস করে। রিকার্ডোর অর্থনীতি তত্ত্বের অন্যতম শক্তি হলো আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা। অবাধ বাণিজ্য যে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের অর্থনৈতিক প্রগতির উপায় তা প্রমাণে তিনি প্রণয়ন করেন বিখ্যাত তুলনামূলক সুবিধার সূত্র (Law of Comparative Advantage)। আন্তর্জাতিক বাজারে যখন থেকে পণ্যমূল্য নির্ধারণে পণ্যের দুস্প্রাপ্যতা (scarcity) সংশ্লিষ্ট বিষয়টি গৌণ হতে থাকে তখন থেকে তুলনামূলক সুবিধার তত্ত্বের অন্তর্নিহিত ভ্রান্তি স্পষ্ট হতে থাকে। এক্ষেত্রে রিকার্ডোর চিন্তা-ভাবনা হয়তো বা তার সময়কালে গ্রহণযোগ্য ছিল, কিন্তু তা সর্বজনীনতা পায় নি। এটাকে 'দর্শনের দারিদ্র্য' ছাড়া আর কি নামে অভিহিত করা যায়? রিকার্ডো তাঁর জীবনের শেষের দিকে এসে সচেতনভাবেই তাঁর অন্বেষার বিষয় হিসেবে বেছে নেন মজুরি ও মুনাফা এবং মুনাফা ও খাজনার ভেতরের শ্রেণি-স্বার্থগতদ্বন্দ্বকে। এইদ্বন্দ্বকে তিনি সরলচিত্তে সমাজের প্রাকৃতিক নিয়ম বলে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু, এই সময়েই বুর্জোয়া অর্থনীতি এমন এক সীমান্তে এসে পৌঁছুল, যা পেরিয়ে যাওয়ার সাধ্য তার ছিল না। রিকার্ডোর জীবদ্দশাতেই এবং তাঁর বিরুদ্ধেই, তা সমালোচনার সম্মুখীন হল, সিসমন্ডির তরফ থেকে।[৯]

অর্থনীতি শাস্ত্রের চিন্তা ইতিহাসে জেরেমী বেন্থামের (১৭৪৮-১৮৩২) সুখ বা উপযোগিতার (utility) তত্ত্ব যা আসলে সম্ভাবনাময় এক হস্তক্ষেপপন্থী তত্ত্ব (intrventionist doctrine)। বিষয়টি দর্শনগতভাবে নতুন দিক উন্মোচনের প্রয়াস। বেন্থাম যুক্তি দিলেন যে প্রত্যেকটা কাজই যে পরিমাণে সুখ সৃষ্টি করে থাকে, নৈতিক বিচারে তা ঠিক ততটুকুই মূল্যবান। তাঁর মতে, বহু মানুষের যদি সামান্য করেও সুখ বৃদ্ধি করা যায়, তবে তা সামান্য কয়েকজন মানুষের প্রত্যেকের বিরাট পরিমাণ সুখ বৃদ্ধির চেয়ে ভাল। বেন্থামের উপযোগিতাবাদ তত্ত্বটি তত্ত্ব হিসেবে সুখপাঠ্য। কিন্ত প্রশ্ন থেকেই যায় আসলে উপযোগিতা কি, কার উপযোগিতা, কি তার পরিমাপ, শ্রেণি বিভক্ত সমাজে বহুমানুষের সামান্য সুখ বৃদ্ধি গুটিকয়েক ধনী-সুপার-ডুপার ধনীর সুখ হ্রাস করে সম্ভব কিনা?

---

[৮] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, Foley. K. Duncan. 2006, Adam's Fallacy: A Guide to Economic Theology. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press. pp. xi-xiv, 1-3, 28-44.

[৯] দেখুন, কার্ল মার্কস, ১৯৮৮, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ: ২৫।

জ্ঞানজগতের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার আত্মস্থ করে তার নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণপূর্বক অর্থনীতি শাস্ত্রকে যিনি সর্বপ্রথম এক ঐতিহাসিক (historical), সামূহিক (holistic), সর্বজনীন (universal) সাধারণ সূত্রের (general law, universal law) আওতায় কাঠামোবদ্ধ করে এ শাস্ত্রের 'দর্শনের দারিদ্র্য' দূরীকরণে স্বার্থকতা দেখিয়েছেন তিনি কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)। এবং অথনীতি শাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাসে এ কৃতিত্ব সম্ভবত এককভাবে মার্কসেরই– এ কথা বললে আদৌ অত্যুক্তি হবে না। উল্লেখ্য যে এ প্রবন্ধে আমি যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছি অর্থাৎ "অর্থনীতি শাস্ত্রের বিকাশ ও নব্য-উদারবাদী মতবাদ: 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রসঙ্গে"– সে নিরিখে সঙ্গত কারণেই এ রচনায় কার্ল মার্কস অন্যের তুলনায় বেশি জায়গা দখলের দাবি রাখেন; এর অন্যথা মার্কসের প্রতি অবিচার সমতুল। অবশ্য মার্কস নিজেকে নিজে কখনও অর্থনীতিবিদ হিসেবে দাবি করেননি; তিনি নিজেকে একজন 'সামাজিক সমালোচক, বা 'Social critique' হিসেবে মনে করতেন।

অর্থনীতি শাস্ত্রে মার্কসের দর্শনটি তাঁর সামাজিক বিশ্ববীক্ষার (Social Cosmology) অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর সে কারণেই মার্কসের অর্থনীতি শাস্ত্র অন্য সবার তুলনায় ভিন্ন– পূর্ণাঙ্গ এক দর্শন। মার্কসের সামাজিক বিশ্ববীক্ষায় বৃহৎবর্গের প্রধান তিনটি পরস্পর সম্পর্কিত মৌল উপাদান হল: (১) ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি (Classical Political Economy; এডাম স্মিথ-ডেভিড রিকার্ডোসহ যার দর্শনগত সারার্থ ইতোমধ্যে আলোচনা-বিশ্লেষণ করেছি), (২) দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শন (Dialectical and Historical Materialism; প্রধানত হেগেল ও ফয়েরবাখ), এবং (৩) কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব (Utopian Socialism; টমাস কাম্পানেল্লা, ফ্রাঁসো মেরি চালর্স ফুরিয়ের, টমার মোর, লুই ব্লাঙ্ক, রবার্ট ওয়েন)। মার্কসের সামাজিক বিশ্ববীক্ষা এ তিনটি বৃহৎবর্গের কোন সরল সমষ্টি নয়; প্রতিটিকেই মার্কস তাঁর মত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে নিজ দর্শন আবিষ্কারে প্রয়োগ করেছেন, এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে অতীতের সকল প্রচলিত ধারার বিপক্ষে সম্পূর্ণ নিজস্ব-নতুন দর্শন বিনির্মাণ করেছেন। মার্কসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নিজস্ব ও ভিন্নধর্মী। যেমন হেগেলেরদ্বন্দ্ববাদকে মার্কস নিঃশর্ত সমর্থন দেন নি, বলেছেন "আমার ডায়ালেকটিক পদ্ধতি হেগেলের পদ্ধতি থেকে শুধু ভিন্ন তাই নয়, তার একেবারে বিপরীত। হেগেলের মতে মনুষ্য মস্তিস্কের জীবন প্রক্রিয়া অর্থাৎ চিন্তনপ্রক্রিয়া, 'ভাব' নামে যাকে তিনি একটি স্বতন্ত্র সত্তায় পরিণত করেছেন, তাহল বাস্তব জগতের স্রষ্টা এবং বাস্তব জগৎ সেই 'ভাবের' দৃশ্যমান বাহ্যরূপ মাত্র। পক্ষান্তরে, আমার মতে মানব মনের মধ্যে বাস্তব জগৎ প্রতিফলিত হয়ে চিন্তার যে বিভিন্ন রূপে পরিণত হয়, ভাব তা ছাড়া আর কিছুই নয়।...তাঁর (হেগেলের) ডায়ালেকটিকস মাথায় ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর মিথ্যে আবরণের আড়ালে যুক্তির শস্যকণাটিকে আবিষ্কার করতে হলে তাকে আবার ঘুরিয়ে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে হবে"।[১০]

শাস্ত্রীয়ভাবে তরুণ মার্কস অর্থনীতির মানুষ ছিলেন না, ছিলেন আনুষ্ঠানিক আইন শাস্ত্রে পড়াশুনা করা দার্শনিক। তরুণ দার্শনিক মার্কস প্রাথমিক অবস্থায় বুঝতে পেরেছিলেন সমাজের পরিবর্তন-রূপান্তরের কার্যকারণ এবং এ প্রক্রিয়ায়ই হয়ে ওঠেন জ্ঞানজগতের সম্রাট যে সম্রাট নিজেকে শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়ায় গণ্ডিবদ্ধ না রেখে সমাজ পরিবর্তন-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন "এতদিন দার্শনিকেরা পৃথিবীকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এখন প্রয়োজন তা পাল্টে ফেলা"। মার্কসের অর্থনীতিবিদ হয়ে ওঠার শুরুটা তখন যখন তার বয়স ২২ বছর, ১৮৪০ সালের

[১০] কার্ল মার্কর্স, ১৯৮৮, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ: ৩২-৩৩।

দিকে। তিনি জার্মানির এক শহরে গাছ কাটার প্রতিবাদে স্থানীয় দৈনিক 'রেইনিস জাইটুং' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যেখানে আইনি বিষয়াদিই ছিল প্রধান। এ প্রবন্ধের সমালোচনা করে মার্কসেরই চিরস্থায়ী সহযোদ্ধা ও বন্ধু ফ্রিডারিখ এঙ্গেলস (তখনও তাদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি) বলেছিলেন গাছকাটা সম্পর্কিত মার্কসের আইনি ব্যাখ্যা 'দুর্বল', এর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন (এ দুজনের বন্ধুত্বের শুরুটাও এখান থেকে)। এর আগে ইতোমধ্যে মার্কস ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে পড়াশুনা করেন প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাসহ আইন, ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিষয়াদি। নিয়মিতভাবে অর্থশাস্ত্র নিয়ে মার্কসের ব্যাপক অধ্যয়নের কাজটি শুরু হয় ১৮৪৩ সালের শেষ ভাগে, প্যারিসে। অর্থনীতি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনার সময় প্রথম থেকেই তিনি মহাগ্রন্থ রচনা করতে মনস্থ করেন, যার সারমর্ম হবে বর্তমান ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের কঠোর সমালোচনা। এ কার্য সম্পাদনের পথে তাঁর প্রাথমিক গবেষণা কাজগুলি সুনির্দিষ্টভাবে রূপ লাভ করে এইসব রচনায়, যেমন, '১৮৪৪ সালে অর্থনীতি ও দর্শন বিষয়ক পাণ্ডুলিপি', 'জার্মান ভাবাদর্শ', 'দর্শনের দৈন্য', 'মজুরি-শ্রম ও পুঁজি', 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' ইত্যাদি। মার্কসের এসব রচনার মধ্যেই পুঁজিবাদী শোষণের মূলনীতির, পূঁজিপতি এবং মজুরি-শ্রমিকের স্বার্থের মধ্যে আপসহীন বৈপরীত্বের, পুঁজিবাদের সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পর্কের বৈরিভাবাপন্ন ও অস্থিতিশীল চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

'পুঁজি' (Das Capital) গ্রন্থটি অর্থনীতি শাস্ত্রে মার্কসের অনন্যসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত অবদান। মার্কস নিজেই বলেছেন "এ গ্রন্থের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হল আধুনিক সমাজের গতির অর্থনৈতিক নিয়ম প্রকাশ করা", আর ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থ নিয়ে লিখেছেন "পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের অভ্যুদয়ের পর থেকে পৃথিবীতে শ্রমিকদের জন্য এর মত এমন গুরুত্বসম্পন্ন একটি বইও বের হয়নি, যেটি আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সম্পর্ক– সর্বপ্রথম এখানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে"। মার্কস তাঁর জীবনের প্রধান এ গ্রন্থটি রচনা করেন চার দশক ধরে– ১৮৪৩ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন (১৮৮৩) পর্যন্ত। মার্কসের অর্থনীতি দর্শন সংকীর্ণ অর্থের অর্থশাস্ত্র নয় তা রাজনৈতিক অর্থনীতি। মার্কসের অমর গ্রন্থ 'পুঁজি' বা Das Capital-ই তার সহজ প্রমাণ যেখানে এই গ্রন্থের সাব-টাইটেল 'Critique of Political Economy' এবং এ গ্রন্থের ফরাসি সংস্করণের পূর্বভাষ্যে (১৮৭২ সাল) মার্কস বলছেন "আমি বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, ইতোপূর্বে অর্থনীতি বিষয়ে যা কখনো অবলম্বিত হয়নি।...বিজ্ঞানের দিকে যাওয়ার কোন রাজপথ নেই, শুধু তারাই তার উজ্জ্বল শিখরে পৌঁছাতে পারে যারা ক্লান্তিদায়কতার চড়াই বেয়ে ওঠার ভয় পায় না"।[১১] 'পুঁজি' গ্রন্থে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণামকে কার্ল মার্কস তিন খণ্ডে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন, যেখানে প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে পুঁজিবাদী উৎপাদনের (Production) প্রশ্ন;দ্বিতীয় খণ্ডে– পুঁজিবাদী সঞ্চলনের (Circulation) প্রশ্ন; আর তৃতীয় খণ্ডে– সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রশ্ন (Capitalistic production as a whole)। এ গ্রন্থে মার্কস যে অর্থনীতি শাস্ত্রকে শাস্ত্রীয় 'দর্শনের দারিদ্র্য' থেকে মুক্তি দিতে পেরেছেন তার কয়েকটি কারণ-লক্ষণ হতে পারে নিম্নরূপ, যা মার্কসেরই ভাষায়: (১) "সমগ্র জৈবসত্তা হিসেবে জীবদেহের অনুশীলন সেই দেহস্থিত কোষগুলির (cells) অনুশীলন থেকে অনেক সহজ। অধিকন্তু, অর্থনৈতিক রূপসমূহের বিশ্লেষণে অনুবীক্ষণযন্ত্র কিংবা রাসায়নিক বিকারক কোন কাজে লাগে না। বিমূর্তনের শক্তিকেই (power of abstraction) উভয়ের স্থান গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে শ্রমজাত দ্রব্যের

---

১১ কার্ল মার্কস, পুঁজি, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬

পণ্য-রূপ– অথবা পণ্যের মূল্যরূপ– হল অর্থনৈতিক কোষস্বরূপ। যারা তলিয়ে দেখে না তাদের কাছে এইসব রূপের বিশ্লেষণ খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো বলে মনে হবে। এগুলি খুঁটিনাটি ব্যাপার ঠিকই, কিন্তু তা শারীরস্থানের আনুবীক্ষণিক বিশ্লেষণের মতই"।[১২] (২) "পদার্থবিজ্ঞানী যখন কোনো ভৌত বস্তু পর্যবেক্ষণ করেন তখন হয় তিনি এমন একটি স্থান বেছে নেন যেখানে বস্তুটি অন্যান্য জিনিষের বিঘ্নকর প্রভাব থেকে মুক্ত নিজস্ব বিশুদ্ধরূপে উপস্থিত থাকে, অথবা তিনি এমন এক অবস্থায় পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান যেখানে বিশুদ্ধরূপেই বস্তুটিকে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে আমাকে উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি এবং উক্ত পদ্ধতির অনুষঙ্গী উৎপাদন ও বিনিময়ের অবস্থা পরীক্ষা করতে হয়েছে। অদ্যাবধী ইংল্যান্ডই এ উৎপাদন-পদ্ধতির ক্ল্যাসিক ক্ষেত্র"।[১৩] (৩) "মূলত প্রশ্নটি এই নয় যে পুঁজিবাদী উৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়মাবলী থেকে উদ্ভূত সামাজিক দ্বন্দ্বের বিকাশের মাত্রা কম না বেশি। প্রশ্নটি হল সেই নিয়মাবলী সম্বন্ধেই, সেই প্রবণতাগুলি সম্বন্ধেই, অমোঘ ভবিতব্যের মতো যা অবশ্যম্ভাবী ফল প্রসব করে। শিল্পক্ষেত্রে অধিকতর উন্নত দেশ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের সামনে তুলে ধরে তারই ভবিষ্যতের ছবি"।[১৪] (৪) "আমি সমাজের অর্থনৈতিক গঠন রূপকে দেখেছি প্রাকৃতিক ইতিহাসেরই একটি প্রক্রিয়া হিসেবে, তাই আমার দৃষ্টিতে ব্যক্তিবিশেষ যে সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি, সে নিজে কখনই তার জন্য দায়ী হতে পারে না"।[১৫] (৫) "আজকাল বিদ্যমান মালিকানা-সম্পর্কের সমালোচনার তুলনায় নাস্তিকতা তো culpa levis [লঘু অপরাধ]"।[১৬] (৬) "দাস প্রথার বিলুপ্তির পর পুঁজি এবং ভূসম্পত্তিঘটিত সম্বন্ধের আমূল পরিবর্তন প্রত্যাসন্ন। এগুলি হল যুগের লক্ষণ, লাল রাজপোশাক কিংবা পুরোহিতের কৃষ্ণ উত্তরীয়, কোনকিছু দিয়েই তা ঢাকা যাবে না।...তার মানে...বর্তমান সমাজ স্ফটিকদানার মতো নিরেট নয়, এ সমাজ জীবদেহের মতো পরিবর্তনীয় এবং নিরন্তরই তার পরিবর্তন ঘটছে"।[১৭] আমি এসব বিষয় উত্থাপন করলাম এ জন্যে যে মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থে বিশ্লেষিত পুঁজিবাদের উদ্ভব-বিকাশ-পরিণামের কার্যকরণ সম্পর্ক কখনও বোঝা সম্ভব নয় যদি গবেষণার পদ্ধতিতাত্ত্বিক (Methodology of Research) উল্লিখিত বিষয়াদি অনুধাবন না করা যায়। এ প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলাম এ জন্যেও যে মার্কসই তার পুঁজি গ্রন্থের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের উত্তর ভাষে লিখেছেন 'পুঁজি' গ্রন্থে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, সেটা যে কেউ বোঝেনি তা বোঝা যায় সে সম্বন্ধে তৈরি নানা পরস্পর বিরোধী ধারণা থেকেই"।[১৮]

১৮৫০ সাল নাগাদ কার্ল মার্কস আধুনিক অর্থশাস্ত্র– রাজনৈতিক-অর্থনীতি শাস্ত্রের দর্শন জগতের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। অর্থনীতি শাস্ত্রকে 'দর্শনের দারিদ্র্য' অপবাদ থেকে মুক্ত করেছেন। অর্থনীতি শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় মুক্তি ঘটাতে মার্কসকে আবিষ্কার করতে হয়েছে অনেক তত্ত্ব যার অন্যতম হলো; আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার (Socio-economic Formation) তত্ত্ব, শোষণ-বিচ্ছিন্নতা-অর্থনৈতিক স্বার্থসহ শ্রেণি

[১২] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯

[১৩] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯

[১৪] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯-২০

[১৫] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১

[১৬] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১

[১৭] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২

[১৮] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০

সংগ্রামের তত্ত্ব,[১৯] পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থার প্রাকৃতিক অবসানের তত্ত্ব[২০], পুঁজিবাদে পণ্য উৎপাদনের সর্বজনীনতার তত্ত্ব (capitalism as a system of universal commodity production), পণ্যের বিনিময় মূল্য নিরূপনে বিমূর্ত শ্রমের (abstract labor) তত্ত্ব ইত্যাদি। মার্কস-ই প্রথম যিনি বললেন যে রাজনৈতিক অর্থনীতি শাস্ত্র হবে সমাজে উৎপাদন সম্পর্কের (production relations) সাথে উৎপাদিকা শক্তির (productive forces) আন্তসম্পর্ক নির্ণয়কারী শাস্ত্র, যেখানে মূল কথা হলো নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক যেমন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নির্ধারণ করবে তেমনি উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে বাধার কারণ হলে পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ককে বিদায় নিতে হবে (এটাই সিস্টেমের 'মৃত্যুঘণ্টা', এটাই সমাজ বিপ্লবের সূচনা লগ্ন)। এ অর্থে মানুষের বিকাশ, সমাজের বিকাশ, সভ্যতার বিকাশ কোন অনড়-স্থীর (static, stationary status) বিষয় নয় তা নিয়ত পরিবর্তনশীল (ever changing, dynamic) বিষয়। এ বিষয়ের বিশ্লেষণে মার্কসই প্রথম দেখালেন সভ্যতার ইতিহাসে ৫-ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার (socio-economic formation) উপস্থিতিঃ (১) আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, (২) দাস উৎপাদন ব্যবস্থা, (৩) সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, (৪) পুঁজিবাদি উৎপাদন ব্যবস্থা, এবং (৫) সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা (যার প্রথম স্তরকে বলা হয় সমাজতন্ত্র)। যেখানে প্রতিটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার স্ববৈশিষ্ট্যের উৎপাদন পদ্ধতি (mode of production) আছে। আর প্রতিটি উৎপাদন পদ্ধতি নির্দিষ্ট ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক (production relation) ও উৎপাদিকা শক্তির (productive force) দ্বান্দ্বিক সমাহার। যেখানে উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রধান নিয়ামক হলো উৎপাদনের উপায়ের (means of production– যেমন জমি, জলা, যন্ত্রপাতি-কলকারখানা ইত্যাদি) উপর

---

[১৯] এ প্রসঙ্গে কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছেন "ইতোপূর্বে যেসব সমাজ দেখা গিয়েছে, তাদের সকলেরই ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস" (বিস্তারিত দেখুন, Marx, Karl and F. Engels. 1848. The Communist Manifesto)।

[২০] যা 'পুঁজি' গ্রন্থে তো বিস্তারিত আছেই। তারও আগে মার্কস অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গ গ্রন্থে (১৮৫৮ সালে) লিখেছেন– তারপরই "সমাজ বিপ্লবের যুগ শুরু হয়" ('Then begins the era of social revolution'); ঘটে যায় 'উচ্ছেদকদের উচ্ছেদ' ('expropriators are expropriated')। বিষয়টির গুরুত্বের কারণে এ পাদটিকায় একটু বিস্তারিত উদ্ধৃত করা হলো। মার্কস লিখেছেন "অধ্যয়ন চালিয়ে যে সাধারণ সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হলাম এবং একবার উপনীত হওয়ার পর যা আমার অধ্যয়নের পথ-নির্দেশক নীতি হয়ে উঠল তার সারসংক্ষেপ উপস্থিত করা যায় নিম্নলিখিতভাবে। তাদের জীবনীয় সামগ্রীর সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে, মানুষে মানুষে অবশ্যম্ভাবী রূপেই নির্দিষ্ট কতকগুলি সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেগুলি তাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, যথা তাদের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশে এক নির্দিষ্ট স্তরের উপযুক্ত উৎপাদন-সম্পর্ক। উৎপাদনের এই সম্পর্কগুলির সামগ্রিকতাই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, প্রকৃত বনিয়াদ, যার উপরে মাথা তুলে দাঁড়ায় এক আইনগত ও রাজনৈতিক সৌধ এবং বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট রূপের সামাজিক চৈতন্য যার অনুষঙ্গী। বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-ব্যবস্থা সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত জীবনের সাধারণ প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। মানুষের চৈতন্য তাদের অস্তিত্বকে নির্ধারিত করে না, বরং তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চৈতন্যকে নির্ধারিত করে। বিকাশের এক বিশেষ স্তরে বিদ্যমান উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে কিংবা– একই কথা শুধু আইনগত ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছ– এযাবৎ সেগুলি যার কাঠামোর মধ্যে কাজ করেছে সেই মালিকানা-সম্পর্কের সঙ্গে সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তিগুলির সংঘাত বাধে। এই সম্পর্ক উৎপাদন শক্তিগুলির বিকাশের আকার থেকে পরিণত হয় তাদের শৃঙ্খলে। তখন শুরু হয় সমাজ-বিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক বনিয়াদের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে, আগেই হোক অথবা পরেই হোক, সমগ্র বিশাল সৌধটির রূপান্তর ঘটে। এরূপ রূপান্তর বিচার-বিশ্লেষণ করার সময়ে, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মতো যথাযথভাবে যা নির্ধারণ করা যায় উৎপাদনের সেই অর্থনৈতিক পরিবেশের বৈষয়িক রূপান্তর, আর আইনগত রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিল্পকলাগত ও দার্শনিক– সংক্ষেপে, যে-সমস্ত মতাদর্শগত রূপের মধ্যে মানুষ এই বিরোধ সম্পর্কে সচেতন হয় ও লড়াই করে তা দূর করে, এই দুয়ের মধ্যে সর্বদাই প্রভেদ-নির্ণয় করা দরকার" (দেখুন, কার্ল মার্কস, ১৯৮৩, অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে, মস্কো: প্রগতি প্রকাশনা, পৃ: ১৩)।

মালিকানার ধরন (হতে পারে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী, ঐতিহ্যগত, প্রথাগত, সর্বজনীন ইত্যাদি), আর উৎপাদনের উপায়-এর মূল উপাদান হলো শ্রমের বস্তু ও শ্রমের উপায় বা হাতিয়ার। আর উৎপাদিকা শক্তির প্রধান তিনটি মৌল উপাদান হলো (১) উৎপাদনী অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতাসহ শ্রমশক্তি– মানুষ, (২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, (৩) উৎপাদনের উপায়। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নিরন্তর। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন অথবা সমাজ-অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে তখন যখন নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।[২১]

মার্কস যে অর্থনীতি শাস্ত্রকে 'দর্শনের দারিদ্র্য' থেকে উদ্ধার করে সমগ্র এই শাস্ত্রটিকেই বৈজ্ঞানিকভাবে শক্ত পায়ের উপর দাঁড় করাতে পেরেছেন তার কারণ-সংশ্লিষ্ট দু'একটা উদাহরণ দেয়া সঙ্গত হবে। এ সবই 'পুঁজি' গ্রন্থে আছে যা সম্পর্কে অর্থনীতি শাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাসে মার্কসের আগে কেউই ভাবেননি। প্রথমত: অর্থনীতি শাস্ত্রের ইতিহাসে মার্কসই প্রথম যিনি পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ শুরু করেছেন সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দিয়ে নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিত 'একক পণ্য দিয়ে যেখানে একক একটি পণ্য হলো তা যার মধ্যে পুঁজিবাদের সকলদ্বন্দ্বসংঘাত ঘনীভূত অবস্থায় পাওয়া সম্ভব। এ মর্মে মার্কস লিখেছেন "যে সমস্ত সমাজে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির প্রাধান্য বর্তমান, সেখানকার ধনসম্ভার পণ্যের এক বিপুল সমারোহরূপে দেখা দেয়, আর এক একটি পণ্য এ ধনসম্ভারের প্রাথমিক রূপ হিসেবে দেখা দেয়। সে কারণেই আমার গবেষণাও শুরু হয়েছে পণ্যের বিশ্লেষণ থেকেই"।[২২] দ্বিতীয়ত, হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে কেউই বলতে পারলো না কি সেই কারণ যার ফলে দুটো পণ্যের মধ্যে বিনিময় হয় (exchange)। মার্কসই প্রথম এ কারণ উদঘাটন করে পুঁজি গ্রন্থে লিখলেন "একদিকে সমস্ত শ্রমই হল শারীরবৃত্তের দিক থেকে, মানুষের শ্রম শক্তির ব্যয়, এবং একই রকম বিমূর্ত মানবিক শ্রম হিসেবে, তা পণ্য মূল্য সৃষ্টি এবং গঠন করে। অপর দিকে সমস্ত শ্রমই হল এক একটি বিশিষ্টরূপে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সম্পাদিত মানুষের শ্রমশক্তি, এবং তার ফলে, উপযোগী শ্রম হিসেবে তা তৈরি করে ব্যবহার মূল্য"।[২৩]

এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত যে মার্কসের অনুসারীদের একটা সহজাত প্রবণতা আছে তা হল: যা মার্কসের অবদান নয় সেটাও (সম্ভবত অজ্ঞতার কারণে) মার্কসের নামে চালিয়ে দেয়া আর যেখানে মার্কসের অবদান ঐতিহাসিক- মৌলিকতম তা উচ্চারণ না করা (এটাও সম্ভবত অজ্ঞতার কারণেই)। যেমন অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রেই অনেকেই বলে ফেলেন উদ্বৃত্তমূল্যের তত্ত্ব অথবা মূল্যের শ্রম তত্ত্বের স্রষ্টা মার্কস– আসলে উভয়ই ভ্রান্ত ধারণা, এ দুয়ের কোনটিই মার্কসের আবিষ্কার নয়। উদ্বৃত্তমূল্যের তত্ত্বকথা মার্কসের বেশ আগেই বলেছেন ফিজিওক্রাট ফ্রান্সুয়া কেন্নে এবং ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের উইলিয়াম পেটি এবং এডাম স্মিথ, আর মূল্যের শ্রম তত্ত্বের বিষয়টিও মার্কসের আগে এডাম স্মিথ বলেছেন– বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কস শুধু তার স্ব-উদ্ভাবিত পদ্ধতিতত্ত্ব ও গভীর জ্ঞান দিয়ে এ দুটি তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ করে ভিন্ন আঙ্গিকে সূত্রবদ্ধ করেছেন। আবার অর্থশাস্ত্রে মার্কসের ঐতিহাসিক মৌলিকতম আবিষ্কারের অনেক বিষয়ই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনুচ্চারিত থেকে যায়। যেমন পুঁজিবাদের উৎপাদন অথবা পুঁজিবাদী সিস্টেম বুঝার ক্ষেত্রে "একক পণ্যের বিশ্লেষণ" (Analysis of single commodity when capitalism is a system of universal commodity production), পণ্যের মূল্য সংশ্লিষ্ট

---

[২১] এসব বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ১৯৮৫, বিশ্ববীক্ষার বিষয়: সম্পাদকের বক্তব্য, পৃ. ১৫-২১

[২২] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭

[২৩] কার্ল মার্কস, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১

ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্যের নিগূঢ় অর্থ, এবং সবচে মৌলিক বিষয় যা মার্কসকে অন্তত অর্থশাস্ত্রে মার্কস হিসেবে অমরত্ব দিয়েছে– "বিনিময় মূল্য নির্ধারণে অথবা পণ্যমূল্য নির্ধারণে বিমূর্ত শ্রম" (Theory of Abstract Labor), এবং "পণ্যে নিহিত শ্রমেরদ্বিবিধ চরিত্রের প্রকৃতি" (Dual nature of labor embodied in a commodity)।

এ কথাগুলো বললাম অনেক কারণে, যার অন্যতম হল আমার দু-একটি প্রায়োগিক বাস্তব ধারণা (যা সম্ভবত অভ্রান্ত, তবে ভ্রান্ত হলে আশ্বস্ত হবো) —"বুঝে সুঝে কার্ল মার্কসের দর্শনের অনুসারী হওয়া কোন সহজ ব্যাপার নয়", "ঘোষণা করে মার্কসবাদী হওয়া যতটা সোজা মার্কসবাদ আত্মস্থ করা ততটা সোজা নয়"; "যেখানেই মানুষ শোষিত-নিস্পেষিত-নির্যাতিত-বঞ্চিত হবে সেখানেই মার্কসবাদী হবার চাহিদা তত বাড়বে"। তবে মার্কসের পুঁজি (Das Capital) গ্রন্থটির অন্তর্নিহিত বিষয়াদি না বুঝে অথবা ভুল বুঝে যে উপকারও হয়নি তা নয়। যেমন রাশিয়ায় জার সম্রাটের আমলে (১৮৭০-এর দিকে) মার্কসের পূঁজিগ্রন্থের রুশ ভাষায় অনুবাদ প্রকাশের জন্য প্রন্থটি যখন জার-সম্রাটের সেন্সর বোর্ডের কাছে পাঠানো হল তখন জার সম্রাটের আজ্ঞাবাহী সেন্সর বোর্ড না বুঝে অনুমতি দিল এই বলে যে "গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তু হল কিভাবে একজন ভাল পুঁজিপতি হওয়া যায় তার দিক নির্দেশনা" ("guide to how to be a good capitalist")। আবার মার্কসের তত্ত্ব দর্শন আত্মস্থ না করেই অনেকে নিজেকে মার্কসবাদী হিসেবে ঘোষণা করে অনেকটা ধর্মের গোঁড়ামি অথবা অন্ধত্বের শিকার হয়ে মৃত মার্কসের তেমন ক্ষতি করতে পারেননি তবে ক্ষতি করেছেন সমাজের বিশেষত রাজনৈতিক সমাজের।

মার্কসের আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতি শাস্ত্রকে মূল্যের শ্রম তত্ত্বটা বিসর্জন দিতে হলো। না বসে থেকে তারা আয় বণ্টন ও ব্যবসা-চক্রের দিকে মনোযোগ দিয়ে অর্থনীতি শাস্ত্রে নতূন পথের সন্ধান খুঁজলেন। নতুন পথের মূল বক্তব্যটা বেশ সোজাসাপ্টা: কোন দ্রব্য বা সেবারমূল্য ঐ দ্রব্যে বা সেবার কতটা শ্রম ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে নির্ধারিত হবে না বরং তা ঠিক হবে যা কেনা হয়েছে তার শেষ এককটা কি পরিমাণ প্রয়োজন মিটিয়েছে তা দিয়ে। এটাই বিখ্যাত প্রান্তিক উপযোগনীতি (Principle of marginal utility)। এ হলো বেন্থামীয় উপযোগবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব। প্রান্তিক উপযোগের এ নীতিটা বিশ্লেষণ করেছেন কার্ল মেন্গার (১৮৪০-১৯২১), উইলিয়াম স্ট্যানলী জেভনস (১৮৩৫-১৮৮২) এবং লিও ওয়াল্রাস (১৮৩৭-১৯৭০)। প্রান্তিক উপযোগের নীতিটি মেনগার বুঝিয়েছেন ক্রেতার প্রান্তিক (বা শেষ) এককের তৃপ্তি দিয়ে; জেভনস দেখালেন যে প্রান্তিক অবস্থানে উপযোগিতা হ্রাস পায়; আর ওয়াল্রাস দেখালেন কেমন করে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই ক্রেতার খরচ করবার সিদ্ধান্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উপযোগবাদ আর প্রান্তিক উপযোগনীতির ধারণাগুলি অর্থনীতি শাস্ত্রের পুরো কেন্দ্র বিন্দুকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শ্রেণি বিভাজন আর তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ চিন্তা থেকে সরিয়ে দিল– সরিয়ে দিল সেখান থেকে যার উপর ইতিপূর্বে রিকার্ডো এবং মার্কস জোর দিয়েছিলেন। অর্থনীতিশাস্ত্র সমষ্টির চিন্তাদর্শন ও সামাজিক চিন্তা দর্শন থেকে একক ব্যক্তির এবং ব্যক্তি ক্রেতার (individual consumer) সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত হল। অর্থনীতি শাস্ত্রের এ এক মহাপশ্চাৎপদতা। পুঁজিবাদে যখন বৈষম্য ক্রমবর্দ্ধমান, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার গভীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যখন জরুরি, আয়-বণ্টননীতি যখন আরো গভীর গবেষণার দাবি রাখে, সমষ্টির চিন্তা ও সামাজিক চিন্তা যখন আরো বেশি প্রয়োজন, পণ্য-দ্রব্য ও সেবা সরবরাহ নিয়ে যখন আরো অনেক ভাবনা জরুরি, তথ্য অসামঞ্জস্য (information asymmetry) যখন বাস্তবতা ঠিক তখনই একক ব্যক্তি এবং একক ক্রেতা-ব্যক্তি নিয়ে এ অতিভাবনা দুর্ভাবনারই বিষয়। এসব করে প্রকৃত অর্থে অর্থনীতি শাস্ত্রের 'দর্শনের

দারিদ্র্য' বাড়ানো হলো। বলা চলে অর্থনীতি শাস্ত্রের দর্শনের দারিদ্র্য চিরস্থায়ীকরণের বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করা হল।

অর্থনীতি শাস্ত্রের 'দর্শনের দারিদ্র্য' কিভাবে চিরস্থায়ীকৃত হলো এতক্ষণ সেসবের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে দর্শন শাস্ত্রীয় কয়েকটি দিক না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর তা হলো এই যে অর্থনীতি শাস্ত্রের এ দারিদ্র্য চিরস্থায়ীকরণের প্রয়াসে দোষটা অর্থনীতিবিদদের না'কি অর্থনীতি শাস্ত্রের না'কি উভয়েরই? যদিও এ প্রশ্নের বেশ যথামাত্রায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে তথাপি আরো একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করি। আর সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণটি নিম্নরূপ: অর্থনীতিবিদেরা এখন এক শ্রেণির মানুষ যাদের বলা যায় "অর্থনীতিবিদ শ্রেণি", যারা এমন ভাবুক যে 'ক্ষুদ্রার্থের' অর্থনীতি শাস্ত্রের বাইরে বিচরণে তাঁরা অপারগ। এ অপারগতায় তাঁদের খুব দোষ নেই; দোষ অর্থনীতি শাস্ত্রেরই অন্তর্নিহিত; দোষ অর্থশাস্ত্রের যে ধারা অথবা স্কুল তাঁরা অনুসরণ করেন সেখানেই বড় মাপের গলদ আছে। এ গলদ সাধারণ কোনো গলদ নয়। এ গলদ প্রধানত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ধারণাগত সংকট উদ্ভূত– প্রকৃত সত্য উপলব্ধি না করতে পারার সংকট। বিজ্ঞানী ফ্রিটজফ কাপ্রার মতে বিষয়টি এরকম "উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্ব, জ্বালানী সংকট, স্বাস্থ্যসেবা খাতে সংকট, দূষণ ও অন্যান্য পরিবেশগত বিপর্যয়, সন্ত্রাস ও অপরাধের বাড়বাড়ন্ত, এবং অনুরূপ সবকিছু– এসবই একই সংকটের বিভিন্নমুখী চেহারা। সংকটটি মূলত উপলব্ধির সংকট"[২৪]। পুরো গত শতক আর এ শতকের এখন পর্যন্ত সামাজিক বিজ্ঞানিরা (যারা মানুষের স্বভাব-আচরণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক নিয়ে ভাবেন, যেমন অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক নৃবিজ্ঞান, এমনকি ইতিহাস শাস্ত্র) সংশ্লিষ্ট বাস্তবতা বিচার-বিশ্লেষণে মূলত কার্টেজিয় ধারণাকাঠামো (Cartesian fremework) ব্যবহার করেছেন যে ধারণা কাঠামো অনুযায়ী দার্শনিক দেকার্তের জ্ঞানতত্ত্ব (যেখানে বলা হতো বস্তুর গতির আদি কারণ হচ্ছে ঈশ্বর; মানুষ হচ্ছে দেহ এবং মনের সম্মিলিত সংগঠন; দেহ হচ্ছে মনহীন বস্তু আর মন হচ্ছে বস্তুহীন সত্তা; "আমার নিজের অস্তিত্ব সন্দেহের উর্ধ্বে") থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে বলা হলো মানবিক-সামাজিক বিজ্ঞানের কাজ 'মন' (*res congnitans*) নিয়ে আর প্রকৃতি বিজ্ঞানের কাজ 'বস্তু' (*res extensa*) নিয়ে। বিজ্ঞানী ফ্রিটজফ বলছেন– প্রকৃত অর্থে বিশ্বকে সঠিকভাবে অনুধাবন ও উপস্থাপনে প্রয়োজন কার্টেজিয় ধারণা কাঠামো থেকে বেরিয়ে "ইকোলজিক্যাল চিন্তা-অবস্থান" (অর্থাৎ যে বিদ্যায় পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীজগতের সম্পর্ক আলোচিত হয়) গ্রহণ করা। দেকার্ত ও কার্টেজিয় ধারণা সংশ্লিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বীয় এসব কথাবার্তা দর্শন শাস্ত্রীয় বিধায় অর্থনীতির জন্য আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ নিউটনের পদার্থবিদ্যা-বলবিদ্যা আর কার্টেজিয় প্যারাডাইম– এ দুয়ের সমন্বয়ে সামজিক বিজ্ঞানীরা বিশেষত অর্থনীতিবিদেরা এতকাল স্ব-শাস্ত্রিয় যেসব বিষয়াদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে মডেল বিনির্মাণ করে চলেছেন সেসবই প্রতিনিয়ত ভ্রান্ত প্রমাণিত হচ্ছে, প্রমাণিত হচ্ছে বাস্তবের সাথে যোগসূত্রহীন শাস্ত্র হিসেবে। বর্তমান যুগের অর্থশাস্ত্র সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য সকল জ্ঞান-শাখার মতই খণ্ডিত ও লঘুকৃত এপ্রোচ (fragmented and reductionist approach) দ্বারা পরিচালিত। এসব কারণেই প্রচলিত অর্থনীতিবিদেরা অর্থাৎ 'অর্থনীতিবিদ শ্রেণি' "বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে অর্থনীতি শাস্ত্র সামুহিক-সামগ্রিক ইকোলজিক্যাল ও সোশাল সিস্টেমের ক্ষুদ্র একটি দিক মাত্র যেখানে জীবন্ত ঐ সিস্টেমে মানুষ একে অন্যের সাথে এবং প্রকৃতির সম্পদের সাথে প্রতিনিয়ত

[২৪] বিস্তারিত দেখুন, Fritjof Capra. 1988, The Turning Point: Science, Society and the Rising Culture. New York: Bantam Books, pp. 15-16, 188-191.

সম্পর্কিত, যে প্রকৃতির বেশির ভাগই প্রাণ-বিশিষ্ট সত্ত্বা। এসব কিছু বিবেচনা করে অর্থনীতি শাস্ত্রে 'দর্শনের দারিদ্র্য' নির্দেশে ফ্রিটজফ বলছেন, "সামাজিক বিজ্ঞানের মৌলিক ভ্রান্তি হলো এই যে তারা এ সামুহিক-অন্তসম্পর্কিত গঠন-কাঠামোকে বিভাজিত করে খণ্ডিত করে, এবং প্রতিটি অংশকে ভিন্ন অংশ মনে করে বিভিন্ন একাডেমিক বিভাগে চর্চা করে, এভাবেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অর্থনৈতিক শক্তির মৌল বিষয়াদি অবজ্ঞা করেন আর অর্থনীতিবিদেরা তাদের মডেলে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা যুক্ত করতে ব্যর্থ হন। ... অন্য আরো একটা অতিব গুরুত্ববহ বিষয় যা অর্থনীতিবিদেরা অতিমাত্রায় অবজ্ঞা করেন তা হল– অর্থনীতির গতিময় (dynamic) বিবর্তন। ... জীবনের বিষয়াদি খন্ডিতকরণের এবং পৃথক কামরাভুক্ত করার কারণে তাত্ত্বিক সমস্যার গাণিতিক সমাধানে অর্থনীতিবিদদের আর তেমন কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না।... মূল্য আছে কিন্তু মূল্যায়িত করা হয় না– এ দিক থেকে অর্থনীতিবিদরা এতকাল পর্বতসম ব্যর্থ চর্চা করেছেন"।

অর্থনীতিশাস্ত্রে দু'জন মার্কসের কথা বলা হয়। প্রথম মার্কস হলেন কার্ল মার্কস "যিনি পুঁজিবাদের মৃত্যুঘণ্টা প্রমাণ করেছিলেন", আর দ্বিতীয় মার্কস হলেন জন মেইনার্ড কেইন্স যিনি "মৃত্যু ঘন্টা থেকে পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে ছিলেন"। কেইন্স ১৯৩৬ সালে লিখলেন "The General Theory of Employment, Interest, and Money", যাকে এডাম স্মিথের 'Wealth of Nations' এবং কার্ল মার্কসের 'Das Capital'এর সমতুল্য মৌলিক চিন্তা-গ্রন্থ বলা হয়। বিশ্ব মহামন্দা থেকে পুঁজিবাদ উদ্ধার কাজে বেকার সমস্যার কার্যকারণ উদঘাটনে কেইন্স অর্থনীতি শাস্ত্রে নতুন ভাষা সৃষ্টি করলেন। যার অন্যতম ভোগের আগ্রহ (propensity to consume), নগদ টাকা হাতে রাখার আগ্রহ (liquidity preference), গুণিতক (the multiplier) টাকার সরবরাহের মিলেমিশে এই চলকগুলো স্থির করে দেয় উৎপাদন আর কর্মনিয়োগের মাত্রা এবং সেই সাথে মূল্যমানের উপরও প্রভাব ফেলে। পুরনো তত্ত্ব অনুসারে সুদের হারটাই সঞ্চয় আর বিনেয়োগের মধ্যে সমতা নির্ধারণ করে আর মজুরি কমানোর দ্বারা পূর্ণ কর্মনিয়োগ অবস্থায় পৌছানো যায়– কেইন্সের "জেনারেল থিওরিতে" যে প্রস্তাবনা তা ছিল এ তত্ত্বের একেবারে উল্টো। কেইন্স চেয়েছিলেন আয় বণ্টনে অধিক সমতা এবং দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনীতির সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অনুপার্জিত আয়ের উপরে বাধা নিষেধ। কেইন্সের ধারণায় সকলের জন্য সমৃদ্ধি একটি কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর সামাজিক শৃংখলা অর্জন পরস্পরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রশ্ন হলো পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সেটা কি সম্ভব? মনে রাখা দরকার– কেইন্স এসব কথা বলেছেন এখন থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে যখন তিনিদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেননি, দেখেননি স্নায়ুযুদ্ধ, দেখেননি নব্য-উদারবাদী মতবাদের 'উলঙ্গ দর্শন', দেখেননি বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিশ্বব্যাপি মাতম। এখন তো নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ এবং পল ক্রুগম্যান পুঁজিবাদের আওতায় এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

৪। নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি মতবাদ: সাম্রাজ্যবাদী সেবাদাসত্বের 'উলঙ্গ দর্শন'

অর্থনীতি শাস্ত্রে নব্য-উদারবাদী (Neo-liberalism or Neo-liberal doctrine) মতবাদটি আসলে অষ্টাদশ শতকের ধ্রুপদী উদারবাদী অর্থনীতিবিদদের (যাদের অন্যতম এডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো) অবাধ বাজার বা মুক্তবাজার মতবাদের (Laissez faire doctrine) আধুনিক সংরক্ষণ মাত্র, তবে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের তুলনায় অনেক বেশি আগ্রাস আধিপত্যবাদী। নব্য-উদারবাদী অর্থনৈতিক মতবাদের প্রারম্ভকাল ১৯৬০-এর দিকে হলেও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে তা নিয়ামক রূপ নিয়েছে ১৯৮০-র

দিক থেকে। অর্থনীতি শাস্ত্রে নব্য-উদারবাদী মতবাদের কার্যকারণ বিশ্লেষণে শুরুতেই মনে রাখতে হবে যে তাদের প্রধান পূর্বসূরী এডাম স্মিথ যখন ১৭৭৬ সালের দিকে তার "বাজারের অদৃশ্য হাত" নিয়ে খেলছেন তখন বৃটেনে শিল্প বিপ্লবের সবে শুরুর দিক– পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো সবে গড়ে উঠেছে, আর নব্য-উদারবাদী মতবাদওয়ালারা যখন মুক্তবাজার নিয়ে খেলতে উম্মত্ত তখন পুঁজিবাদি তার সর্বোচ্চ শিখর সাম্রাজ্যবাদে পৌঁছে দুটো বিশ্বযুদ্ধ পার করেছে দুই মেরুর বিশ্ব একমেরুর বিশ্বে রূপান্তরিত হয়েছে, বৃটিশ আধিপত্যের যুগ শেষ হয়ে মার্কিন আধিপত্যের যুগের চার দশক পার করে সাম্রাজ্যবাদের মূল ভরকেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্র এখন বিশ্বের তিন মৌল-কৌশল সম্পদে (জল, জ্বালানি-খনিজ-আকাশ-মহাকাশ) নিরঙ্কুশ মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, এবং এ প্রক্রিয়ায় একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ধনী দেশসমূহের আঁতাত গড়ে তুলেছে এবং পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অশুভ ত্রিভূজীয় আঁতাতের[২৫] মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করছে।

রাজনৈতিক-অর্থনীতির ধারণা হিসেবে উদারবাদের স্বীকৃতি ও খ্যাতির শুরুটা ১৭৭৬ সালে যখন স্কটল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ তার "The Wealth of Nations" পুস্তকে ফর্দ দিলেন যে জাতির সম্পদ বাড়াতে চাইলে যা যা করতেই হবে তা হলো প্রধানত এরকম: সরকারের পক্ষ থেকে বাজার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর নাক-গলানো (intervention অর্থে) কমিয়ে ফেলতে হবে; বাজারের উপর সরকারি হস্তক্ষেপ-নিয়ন্ত্রণ সর্ব নিম্নমাত্রায় নিয়ে আসতে হবে; বাণিজ্য হতে হবে অবাধ, মুক্ত; কোনো শুল্ক রাখা চলবে না (no tariffs); বাণিজ্যে কোনো ধরনের বাধা (no barriers) রাখা চলবে না; ব্যবসা-বাণিজ্য বাজারকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে (no controls)। এবং শেষ পর্যন্ত বললেন দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই– "বাজারের অদৃশ্য হাত" (invisible hand of market) সব কিছু ঠিকঠাক করে দেবে। আগেই বলেছি আজকের নব্য-উদারবাদ অষ্টাদশ শতকের এই ধ্রুপদি উদারবাদেরই নবতর রূপ তবে তা ঐ উদারবাদের চেয়ে বহুগুণ আগ্রাসী; এক কথায় আধিপত্যবাদী। আজকের নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি শাস্ত্রীয় মতবাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্পষ্ট: সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ স্বার্থ সংরক্ষণে ফর্দ দেয়া, আর সেই ফর্দ তাদেরই সৃষ্ট বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক সংস্থাসহ সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় বাস্তবায়ন করা।

নব্য-উদারবাদী মতবাদ মোটামুটি গত চার দশক ধরে নিরন্তর বলে যাচ্ছে– যদি অর্থনৈতিক উন্নতি চাও এবং দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা কমাতে চাও তাহলে যা যা করতে হবে তা হলো এরকম: মুক্ত বাজার-অবাধ বাজার-বাধাহীন বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করো; এমন অবস্থা সৃষ্টি করো যেখানে বাজার ছাড়া কেউই শাসন করার ক্ষমতা রাখবে না; সবকিছু ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দাও (complete privatization); সরকারকে যদি একটু-আধটু নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নিতে হয় তা হতে হবে সাময়িক এবং পরে তা সম্পূর্ণ ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দিতে হবে। আর নব্য-উদারবাদের এসবই হলোদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর 'ওয়াশিংটন ঐক্যমত' (Washington Consensus)-এর মতাদর্শিক ভিত্তি। বৈশ্বিক

[২৫] নয়া উদারবাদীদের এই অশুভ ত্রিভুজীয় আঁতাত আসলে কি করে, তা কোন উদ্দেশ্যে কিভাবে কাজ করে, কিভাবে বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করে, কিভাবে তা উন্নয়নশীল দেশসমূহকে 'মূলা' দেখিয়ে নব্য-উদারবাদী নীতি গ্রহণে বাধ্য করে, কি তার পরিণাম প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, Ha-Joon Chang. 2008. Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism, পৃ: ১৩-১৮, ২৩, ৩২-৩৬, ৮৭, ৮৮, ১৪৫-১৪৯, ১৫৬-১৫৭।

পর্যায়ে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব স্থাপনে যার উদগাতা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আর সাথে আছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), বিশ্ব ব্যাংক (The World Bank), বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) এবং সংশ্লিষ্ট 'থিংক ট্যাংক'। যৌথ নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে তারা বিশ্বব্যাপী নব্য-উদারবাদ নির্দেশিত 'ওয়াশিংটন ঐক্যমত' ভিত্তিক সংস্কার কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করার জন্য যে দেশকে যেখানে, যে সময়ে, যতদূর চাপ প্রয়োগ সম্ভব তা তারা নির্দ্বিধায় করে থাকে। এই ওয়াশিংটন ঐক্যমত প্রধানত জন উইলিয়ামসন প্রস্তাবিত[২৬] ১০টি নীতি-কৌশলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ঐ নীতি-কৌশলের সারবস্তু নিম্নরূপ: (১) আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে মূল ফর্দ হল সরকারি ব্যয়ে বড় মাপের ঘাটতি থাকবে না। কারণ সরকারি ব্যয়ে বড় মাপের ঘাটতি পুঞ্জিভূত হতে থাকলে তা মূল্যস্ফীতি বাড়াবে, কমাবে উৎপাদনশীলতা। সরকারি ঘাটতি ব্যবস্থা শুধুমাত্র অর্থনীতিতে সাময়িক স্থিতিশীলতার স্বার্থে ব্যবহার করা যেতে পারে; (২) সরকারি ভর্তুকি এমন এক অপচয় যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সহায়ক নয় এবং দরিদ্রদের জন্য কল্যাণকর নয়; (৩) কর কাঠামো সংস্কার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে একদিকে করের ভিত্তি (tax base) সম্প্রসারণ করতে হবে আর অন্যদিকে সৃজনশীল উদ্যোগ (innovation) ও কাজের ফলপ্রদতা (efficiency) বাড়াতে প্রান্তিক কর হার নমনীয় করতে হবে; (৪) বাজার হবে সুদের হারের একমাত্র নির্ধারক এবং সে হার হবে ধনাত্মক তবে প্রকৃত হিসেবে নমনীয় (moderate অর্থে); (৫) অর্থের বিনিময় হার হতে হবে ফ্লোটিং; (৬) বাণিজ্য হতে হবে সম্পূর্ণ উদারিকৃত অর্থাৎ আমদানি উদারিকরণে সবধরণের পরিমাণগত বাধা অপসারণ করতে হবে; বাণিজ্য রক্ষার ক্ষেত্রে স্বল্পমাত্রার এবং অপেক্ষাকৃত সমতামুখী ট্যারিফ থাকতে হবে– ফলে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হবে; (৭) ব্যালেন্স অব পেমেন্টের ক্ষেত্রে 'পুঁজি হিসাব' (capital account) উদারীকরণ করতে হবে যার ফলে এক দেশ থেকে যেন অন্যদেশে বিনিয়োগ প্রবাহ আকর্ষিত হয় এবং বিদেশে অবস্থানরত পুঁজি যেন স্বদেশে বিনিয়োগ হতে পারে; (৮) সকল রাষ্ট্রিয় মালিকানাধীন উদ্যোক্তা-শিল্প প্রতিষ্ঠান বিরাষ্ট্রীকরণ করে ব্যক্তি মালিকানায় রূপান্তরিত করতে হবে; যেসব ক্ষেত্রে সরকার ফলপ্রদ ও ফলপ্রসু ফল দেখাতে পারে না (যেমন টেলিযোগাযোগ) তা বাজারের হাতে ছেড়ে দিতে হবে; (৯) বাজারে অনুপ্রবেশে বাধা সৃষ্টিকারী অথবা যা কিছু প্রতিযোগিতা-প্রতিবন্ধক সবকিছু সরকারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত নিয়ন্ত্রণমুক্ত (deregulation) করতে হবে। এক্ষেত্রে যৌক্তিক কয়েকটি ক্ষেত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন থাকতে পারে, যেমন নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, পরিবেশ ও ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর নজরদারী ইত্যাদি; এবং (১০) ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা-অধিকারের আইনগত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। আসলে এতসব হবে– হতে হবে– দিতে হবে– করতে হবে– এসব বলে নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি মতবাদ উদ্ভূত ফর্দ দিয়ে 'ওয়াশিংটন ঐক্যমত' চাচ্ছেটা কি? চাওয়াটা ঐক্যমতের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট। আর তা হলো যখন দুই মেরুর বিশ্ব ছিল তখন সাম্রাজ্যবাদের মূল কেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইতো বিশ্বের ৩-টি বৃহৎবর্গের মূল সম্পদের উপর অভিগম্যতা (access)- যেগুলি হল (১) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ (fuel, energy, minerals), (২) পানি সম্পদ (water resources), এবং (৩) মহাশূন্য (space)। আর এখন এক মেরুর বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের মূল হোতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের উল্লিখিত বৃহৎবর্গের তিন মূল সম্পদের উপর

[২৬] বিস্তারিত দেখুন, Williamson., John. 1990. "What Washington Means by Policy Reform" in John Williamson, ed. *Latin American Adjustment: How much Has Happened?* Washington, DC: Institute for International Economics.

অভিগম্যতা নিয়ে আদৌ সন্তুষ্ট নয়, তারা চায় ঐ তিন সম্পদের উপর একচ্ছত্র মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ (absolute ownership and control)। আর এসব নিশ্চয়ই বিশ্বের আপামর তাবত মানুষের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিমোচনের লক্ষ্যে নয়, গুটি কয়েক মানুষের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে থাকে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ বলছেন 'Of the 1%, for the 1%, by the 1%'।[২৭]

অনেকেরই মতে নব্য-উদারবাদ এখন "আজকের বিশ্বের চেহারা বিনির্মাণে নির্ধারক মতাদর্শ এবং আমরা নব্য-উদারবাদের যুগে বাস করছি"।[২৮] কেউ কেউ বলছেন নব্য-উদারবাদ প্রধানত "রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রায়োগিক এক তত্ত্ব যা অনুযায়ী মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি (human well-being) সবচে ভালভাবে এগিয়ে নেয়া সম্ভব যদি ব্যক্তির ব্যবসা-বাণিজ্যে উদ্যোক্তা-সংশ্লিষ্ট স্বাধীনতা ও দক্ষতার মুক্তি নিশ্চিতকরণের জন্য এমন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিনির্মাণ করা যায় যেখানে থাকবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর মালিকানা সুরক্ষার শক্তিশালি নিশ্চয়তা, মুক্ত বাজার এবং অবাধ বাণিজ্য। আর রাষ্ট্রের কাজ হবে এসব কাজ সুচারুরূপে প্রতিফলন-উদ্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিনির্মাণ ও লালন করা"।[২৯] আবার কেউ বলছেন নব্য-উদারবাদ হল "এক রাজনৈতিক দর্শন যেখানে সবচে অগ্রাধিকারের বিষয় হল ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদের উপর অধিকার"।[৩০] আর এসব বলতে বলতে নব্য-উদারবাদীদের কেউ কেউ এমন অবস্থানে পৌঁছে যান যখন বলেন পুরোপুরি মুক্তবাজার চাই এবং তা নিশ্চিত করতে হলে সরকার ব্যবস্থাকেই বিলুপ্ত ঘোষণা করতে হবে– এটা হল 'নৈরাজ্যবাদী-উদারবাদ' (anarcho-liberalism)। নব্য-উদারবাদই মহৌষধ–এটি প্রমাণে কারা কারো যুক্তি হল এরকম: "মুক্তবাজার ও অবাধ বাণিজ্য উদ্ভবসূত্রে মানব সমাজে মানুষের যে সৃজনশীল সুপ্ত প্রতিভা এবং উদ্যোগগ্রহণের স্পৃহা আছে তা অবমুক্ত করার একমাত্র মাধ্যম। আর এ মাধ্যম ব্যবহার করলে মানুষের মুক্তি ও জীবন-সমৃদ্ধি উভয়ই বাড়বে এবং সেইসাথে সম্প্রসারিত হবে সম্পদ বিনিয়োগের সবচে ফলপ্রদ ব্যবস্থা"।[৩১]

তাহলে এ পর্যন্ত যা উল্লেখ করলাম তার ভিত্তিতে বলা যায় নব্য-উদারবাদ যা চাচ্ছে পরিণামসহ তা হল এরকম: (১) বাজারই হবে শাসক (rule of the market) এবং অনিয়ন্ত্রিত-মুক্তবাজার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ পথ যা শেষ পর্যন্ত সবার জন্য মঙ্গলজনক হবে। ব্যাপারটা আমার মতে অনেকটা প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগান সাহেবের "সাপ্লাই সাইড ইকনমিকস" এবং "ট্রিকল ডাউন ইকনমিকস" (চুইয়ে পড়া সুবিধের তত্ত্বনীতি)-এর মত যেখানে ইতোমধ্যে দুটিই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

---

[২৭] Stightz Joseph.E, 2013. The Price of Inequality. p.xlvi.

[২৮] Saad-Filho, Alfred and Deborah Johnston. 2005. "Introduction", pp. 1-6 in Alfredo Saad-Filho and Alfredo Deborah Johnston. 2005. Neoliberalism – A Critical Reader.

[২৯] Harvey, David, 2005. A Brief History of Neoliberalism.

[৩০] Blomgren, Anna-Maria. 1997. Nyliberal politisk filosofi. En kritisk analys av Milton Friedman, Robert Nozick och F.A. Hayek. Nora: Bokforlaget Nya Doxa.

[৩১] Hayek, Friedrich A. 1973. Law, Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles and Political Economy. Volume 1: Rules and Order; Murray ([1962/1970] 2004. Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles- Power and Market: Government and the Economy. [Two books republished in one file.] Auburn, Alabama: the Ludwig von Mises Institute. http/www.mises.org/rothbard/mespm.PDF.

(২) সামাজিক খাতে সরকারি ব্যয় কমাতে হবে এবং এমন কি দরিদ্রদের জন্য যে সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনি আছে সেসব কমিয়ে ফেলে আস্তে আস্তে তা উঠিয়ে দিতে হবে। তাদের যুক্তি– এসব করলে নিজেই নিজেকে দেখার সুযোগ বৃদ্ধির ফলে মানুষের মধ্যে উদ্যোগ-উদ্দীপনা বাড়বে, মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা বাড়বে যা এক পর্যায়ে সামাজিক খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেবে। (৩) সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনতে হবে। তাদের যুক্তি– সব কিছুতেই সরকারের নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে আনলে মুনাফা বাড়বে, যা দারিদ্র্য হ্রাসে কাজে লাগবে, পরিবেশ উন্নততর করতে সহায়ক হবে এবং কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা বাড়াবে। (৪) সবকিছু ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দিতে হবে। রাষ্ট্রর মালিকানায় যা কিছু আছে (দু'একটি বিষয় বাদে) সবকিছু বিরাষ্ট্রিকরণ করে ব্যক্তি মালিকানায় (privatization) ছেড়ে দিতে হবে, যেমন ব্যাংক, শিল্প-কারখানা, রেল, হাইওয়ে, বিদ্যুৎ, স্কুল, হাসপাতাল, এমনকি সুপেয় পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ও ল্যাট্রিন। এসবের নিট ফল আসলে যা হবে (ইতোমধ্যে হয়েছে) তা হল একদিকে জাতীয় সম্পদ গুটি কয়েক মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত হবে আর অন্যদিকে অঢেল জনগোষ্ঠি এখনকার চেয়ে অধিকতর দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার শিকারে রূপান্তরিত হবে। (৫) "পাবলিক গুডস" অথবা "কম্যুনিটি"– এসব ধারণা পরিত্যাগ করতে হবে এবং এসব প্রপঞ্চকে "ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব" হিসেবে প্রতিস্থাপন করতে হবে। আর তাই যদি হয় তাহলে এসবের পরিণতি হবে মারাত্মক– দরিদ্র মানুষকে তার সন্তানের শিক্ষা, তার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবার দায়িত্ব, এবং সামাজিক সুরক্ষা-নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদেরকেই নিতে হবে; এবং দরিদ্র মানুষ যদি এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে তাদেরকে 'অলস' বলে দোষ দেয়া হবে। এসব এক্সপেরিমেন্ট ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কিছু দেশে হয়েছে এবং অভিঘাত যা দেখা গেছে তা হল এরকম: নয়া-উদারবাদ মানে "ল্যাটিন আমেরিকায় নয়া-উপনিবেশবাদ", "ইউরোপে মহামন্দার প্রাক লক্ষণ", "এশিয়ায় বিভিন্ন দেশে জাতীয় সম্পদের লুটপাট", "আফ্রিকায় পেছনে হাঁটা" ইত্যাদি।

নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি শাস্ত্র মানুষের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার ধার ধারে না। শুধু তাইই নয় নব্য-উদারবাদ মনে করে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা যে কোনো দেশের উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ বিষয়ে নব্য-উদারবাদের বিশ্বগুরু নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান তো কোনো ধরনের রাখঢাক না করে বলেছেন মুক্তবাজার অর্থনীতিতে আয় বৈষম্য-অসমতা নিয়ে আমাদের ভাবনার কোনো কারণই থাকতে পারে না। আর এর পিছনে তিনি যুক্তি দিয়েছেন: (১) অর্থনীতিকে ভালভাবে কাজ করতে হলে সত্যিকার অর্থে একটা স্তরের বৈষম্য-অসমতা কাম্য; (২) যেভাবেই দেখা হোক না কেন, মুক্তবাজার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক সিস্টেমে একটা পর্যায়ে বৈষম্য-অসমতা থাকবেই (unavoidable অর্থে); এবং (৩) বাজার অর্থনীতিতে মানুষে মানুষে বৈষম্য-অসমতা নন-মার্কেট অর্থনীতির চেয়ে কম।[৩২] মিল্টন ফ্রিডম্যান এসব বলেই ক্ষান্ত হননি। আরো এক ধাপ এগিয়ে আরো যা বলছেন তা শুনলে যেকোনো সুস্থ-মস্তিস্কের ব্যক্তি নিমেষেই অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন। তিনি বলছেন– "আমি মাদক-নেশা জাতীয় দ্রব্য পণ্যাদির বৈধকরণের পক্ষে। আমি যে মূল্যবোধ সিস্টেম ধারণ করি তা অনুযায়ী কোনো মানুষ যদি নিজে নিজেকে হত্যা করতে চায় সে অধিকার তার থাকতে হবে/সে অধিকার তাকে দিতে হবে। নেশা-মাদক জাতীয় দ্রব্যাদি থেকে যে ক্ষতি হয় তার প্রধান কারণ ঐসব দ্রব্যাদির বেচাকেনা অবৈধ"।

32 Milton Friedman. 1962. Capitalism and Freedom; Milton and Rose D. Friedman. 1980. *Free to Choose*.

নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি দর্শন, সে দর্শনের প্রয়োগফল এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণায় অনেক নির্মোহ সত্য স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গবেষণায় যা যা প্রমাণিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম নিম্নরূপ: নব্য-উদারবাদ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে; নব্য-উদারবাদ বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশে দেশে বৈষম্য-অসমতা প্রকট থেকে প্রকটতর করেছে; উন্নয়নশীল বহুদেশে নব্য-উদারবাদের যুগে দারিদ্র বেড়েছে; নব্য-উদারবাদ গণতন্ত্র বিকাশে সহায়ক নয় বরঞ্চ বিভিন্ন দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে; নব্য-উদারবাদী দর্শনের প্রয়োগে ১৯৯০ দশকের প্রবৃদ্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক উপকৃত হননি; নব্য-উদারবাদ কর্পোরেট দুর্নীতি বৃদ্ধির কারণ; অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নব্য-উদারবাদের এঙ্গলো আমেরিকান মডেলের বিপরীতে পূর্ব এশিয়ার মডেল ভাল ফল দিয়েছে; নব্য-উদারবাদী এঙ্গলো-আমেরিকান মডেল সার্বজনীন নয়; নব্য-উদারবাদী দর্শনের বিপরীতে সরকারি কর্মকর্তারা অনেক দেশেই অধিকতর উপযোগী অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল বিনির্মাণ করেছেন; নব্য-উদারবাদী অবাধ বাণিজ্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য অপটিমাল নয় বিশেষত যখন তারা শিল্পোন্নত দেশের সাথে বাণিজ্য করে; মুক্ত-অবাধ বাণিজ্য সে পথ নয় যে পথে আজকের শিল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নত হয়েছে; নব্য-উদারবাদের ধারণা যে অধিকতর অবাধ-মুক্ত বাণিজ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বাড়ায়– এ যুক্তি দুর্বল; বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে যে বিচ্যুতি ঘটে তা নব্য-উদারবাদের প্রবক্তারা এ নিয়ে যা বলেন তার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক; নব্য-উদারবাদী ধারণার বিপরীতে অনেক অর্থনৈতিক তত্ত্ব আছে যা সিলেকটিভ শিল্প উন্নয়ন নীতি সহায়ক; নব্য-উদারবাদীদের ধারণা ভ্রান্ত যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকেরা তাদের সমধর্মী ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকের চেয়ে কম ফলপ্রদ এবং বেশি অদক্ষ; নব্য-উদারবাদের এ ধারণা ভ্রান্ত যে রাষ্ট্রিয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান প্রবৃদ্ধি সহায়ক নয়; নব্য-উদারবাদের ধারণা যে প্যাটেন্ট অধিকার প্রতিষ্ঠা নতুন নতুন অভিজ্ঞান সৃষ্টির সহায়ক– এ ধারণা ভ্রান্ত এবং শিল্পোন্নত দেশের উন্নয়নে প্যাটেন্ট-এর কোনো ভূমিকা ছিল না; নব্য-উদারবাদের মেধাস্বত্ব বিষয়টি উন্নয়নশীল দেশের জন্য ব্যয়বহুল ব্যাপার; নব্য-উদারবাদের আন্তর্জাতিক পুঁজি প্রবাহের উদারিকরণ প্রস্তাব যুক্তিতে টেকে না; আন্তর্জাতিক ব্যাংক ঋণ অনেক দেশেই আর্থিক ভঙ্গুরতার কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে; বৈদেশিক ঋণের সুদ-আসল পরিশোধ বিষয়টি মহাবিপর্যয়ের কারণ হতে পারে; নব্য-উদারবাদের প্রস্তাবিত অনিয়ন্ত্রিত পোর্টফলিও বিনিয়োগ উন্নয়ন সহায়ক নয় এবং তা নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে; বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং অন্যান্য বহুজাতিক কর্পোরেশনের উপস্থিতি উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনেক ধরনের বিপর্যয়কর সমস্যার কারণ; নীতিনির্ধারকদের জানতে হবে যে বৈদেশিক বিনিয়োগ দেশের ভিতরের পুঁজির ব্যাপকাংশ আবার বিদেশে নিয়ে যেতে সাহায্য করে; দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক ব্যবস্থার উদারীকরণ অনেক উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নে ব্যর্থতার কারণ হয়েছে; নব্য-উদারবাদীরা যে আর্থিক সিস্টেমের উদারিকরণের কথা বলেন তা প্রায়শই 'speculation-led development' এর কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে শেষ পর্যন্ত কারেন্সি এবং ব্যাংকিং ক্রাইসিস (সংকট) ঘটে, যা আবার আয় বৈষম্য বাড়ায় এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোর বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং আর্থিক ভঙ্গুরতা বাড়ায়; নব্য-উদারবাদীরা যে বলেন 'পুঁজির বাজার-ভিত্তিক বরাদ্দ' বিনিয়োগ বাড়ানোর এবং অদক্ষতা, অফলপ্রদতা, অপচয় ও দুর্নীতি রোধের শ্রেষ্ঠ উপায়– এসব কথা ঠিক নয়; উদারিকরণকৃত আর্থিক সিস্টেম বেশির ভাগ দেশেই উন্নয়ন-সাফল্যের অংশ ছিল না; নব্য-উদারবাদের ফর্দ অনিয়ন্ত্রিত কারেন্সি কনভার্টেবিলিটি– কারেন্সি অবচিতি এবং সংশ্লিষ্ট বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে, তা পুঁজি পাচার এবং আর্থিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে; নব্য-উদারবাদের ফর্দ যে উন্নয়নশীল দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের বাইরে স্বাধীন সত্তা হতে হবে– এ তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং দেখা গেছে যে কেন্দ্রীয়

ব্যাংকের স্বাধীনতা মূল্যস্ফীতি রোধে ব্যর্থ হয়েছে এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে তেমন ভূমিকা রাখেনি; নব্য-উদারবাদীদের মূল্যস্ফীতি সংক্রান্ত পরামর্শ ভুল পরামর্শ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে এবং ঐ পরামর্শের ফলে এমন মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে হয়েছে যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে পিছনে টেনে ধরেছে; নব্য-উদারবাদীদের পরামর্শে বাজেটে যে বরাদ্দ কাঠামো বিন্যাস করা হয়েছে তার ফল খারাপ হয়েছে, তা জনগণের জীবনমানে ক্ষতির কারণ হয়েছে এবং আশু ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করেনি; ঐতিহাসিকভাবেই দেখা যায় যে কন্টিনেন্টাল ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান-এর অপেক্ষাকৃত অত্যুচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে সে সময়কালে যখন সরকারি (বাজেট) ব্যয় বরাদ্দ ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি এবং বাজেট ঘাটতিও ছিল বেশি; নব্য-উদারবাদীরা সরকারি বরাদ্দের বিপক্ষে অবস্থান করেন কিন্তু একথা ঐতিহাসিক প্রমাণিত যে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ প্রাইভেট বরাদ্দের চেয়ে খারাপও নয় এবং তা ব্যক্তিখাতের বরাদ্দের বাধাও নয়।[৩৩] তাহলে যা দাঁড়ালো সেটা এরকম– নব্য-উদারবাদ আসলে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণিত দর্শন যা কোনো মানদণ্ডেই জনকল্যাণকর নয়– কোনো দেশেই, এবং যা দেশে দেশে rent seeker[৩৪] সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, এবং

[৩৩] প্রতিটি বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, Chang, Ha-Joon and Ilene Grabel. 2005. Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual. pp. 16-20, 22-23, 34-36, 43-45, 48, 60-66, 74, 85-88, 94-99, 112-113, 116-120, 125-126, 143-144, 153-157, 168-177, 180, 182-186, 190-191, 193-196.

[৩৪] 'Rent seeker' এর মর্মানুবাদ হতে পারে দুর্বৃত্ত, পরজীবী শ্রেণি, অনুপার্জিত আয়কারী, লুটেরা, আত্মসাৎকারী, ফাও-খাওয়া শ্রেণি, ফটকাবাজ গোষ্ঠী ইত্যাদি। Rent seeking বিষয়টির ব্যাখ্যাটি এরকম। বিত্তবান বা সম্পদশালী হওয়া যায় দু'ভাবে। প্রথম পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় সম্পদ সৃষ্টির (creation) মাধ্যমে– এটা rent seeking নয়; এ পদ্ধতিতে সমাজের মোট বিত্ত-সম্পদ বাড়ে (total wealth increases)। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎসহ সমরূপী বিভিন্ন পদ্ধতিতে। দ্বিতীয় পদ্ধতির এসবই rent seeking, আর এসবের সাথে যুক্ত যারা তারাই rent seeker। প্রথম পদ্ধতি যেখানে সমাজের মোট বিত্ত বাড়ায় সেখানে rent seeking এর পরিণাম হয় ঠিক উল্টো। Rent seeking সমাজের মোট বিত্ত কমায় এমনকি ধ্বংস করে (total wealth decreases or destroys total wealth)। Rent seeking পদ্ধতির সরব উপস্থিতির অর্থ হলো সমাজের উঁচুতলার বিত্তবানদের বিত্তের বড় অংশ আর নীচুতলার মানুষের দুর্দশার উৎস– বিত্তের সৃষ্টি নয় (not creation of wealth) বিত্তের হস্তান্তর (wealth transfer অর্থে)। এ পদ্ধতিতে আবিষ্কারটা হলো এরকম: উপরতলার ধনীরা জনগণের সম্পদসহ নীচতলার মানুষের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ হাতড়ে নেবে কিন্তু নীচতলার মানুষ বুঝতেই পারবে না– কিভাবে কি হয়ে গেলো! আর rent seeking-এর এই প্রক্রিয়ায় rent seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের এক অশুভ সমস্বার্থের সম্মিলন ঘটে যা দুর্ভেদ্য– যে ত্রিভুজটি দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। Rent seeking এর এ বিষয়টি অর্থনীতির ভাষায় 'zero sum game'ও নয়– এটা প্রকৃত অর্থে 'negative sum game'। বিষয়টি আরো একটু স্পষ্ট করা প্রয়োজন। ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথ যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্যক্তির স্ব-স্বার্থ (self interest) বিকশিত হবার সুযোগ দিলে এক 'অদৃশ্য হাত' (invisible hand of market) অন্য সকলের জীবনসমৃদ্ধি বাড়াবে। কিন্তু ১৯২৯-৩৩ এর বিশ্বমহামন্দা আর ২০০৭-০৮ এর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের পরে এডাম স্মিথের 'অদৃশ্য হাততত্ত্ব' আর কেউ বিশ্বাস করেন কিনা সন্দেহ– 'অদৃশ্য হাত' এখন অদৃশ্য। নব্য-উদারবাদ হল এই অদৃশ্য হাত'এর দৃশ্যমান তত্ত্ব। বাজার ব্যবস্থাটাই এমন যা rent seeker সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করবে; rent seeking সমাজে বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করবে; rent seeking অর্থনীতির instability (অস্থিতিশীলতা) বাড়াবে আর ঐ অস্থিতিশীলতা বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়াবে; rent seeking থেকে উদ্ভূত বৈষম্য-অসমতা মানুষের সুযোগের সমতা কমাবে আর সুযোগের অসমতা বৃদ্ধি বিদ্যমান বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়াবে; আর পুরো এ প্রক্রিয়ায় রাজনীতি ও সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে (বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে" *বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "লোকবক্তৃতা ২০১৪", ২২ মার্চ ২০১৪ (৮ চৈত্র ১৪২০)*, সিনেট ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)।

একই সাথে যা দেশজ rent seeking পদ্ধতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের প্রাণকেন্দ্রসহ আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ জিইয়ে রাখার চেষ্টা মাত্র।

নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি শাস্ত্রের মতবাদ বলছে 'বিশ্বায়ন (globalization) মুক্তবাজার ও অবাধ বাণিজ্যকে অনিবার্য করে তুলেছে। এ সুযোগ নিতে যারা ব্যর্থ হবে ঐতিহাসিক ব্যর্থতার দায়ভার তাদেরকেই নিতে হবে। প্রথমেই বলা উচিত যে গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন-এর উপযোগিতা নিয়ে বিপরীতমুখী স্পষ্ট দুটো পক্ষ সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম পক্ষ 'globaphiles'-দের অবস্থান বিশ্বায়নের পক্ষে, আরদ্বিতীয় পক্ষ globaphobes' (globalization এর কথা শুনলে যাদের গায়ে জ্বর ওঠে)–দের অবস্থান বিপক্ষে। মাঝামাঝি আর এক পক্ষ আছে যারা বলার চেষ্টা করেন যে বিশ্বায়ন যেহেতু বাস্তবতা সেহেতু বিশ্বায়ন কিভাবে সবার জন্য উপকারি হতে পারে তা ভাবা দরকার। মধ্যপক্ষে অবস্থান নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ যা বলছেন তা এরকম: বিশ্বায়ন যেভাবে কাজ করছে তা দারিদ্র্য হ্রাস করছে না; বিশ্বায়ন ট্রাডিশনাল মূল্যবোধের সাথে বিরোধাত্মক; বিশ্বায়ন গ্রামীণ অর্থনীতিতে ঋণাত্মক ভূমিকা রাখছে; বিশ্বায়ন গণতন্ত্রকে পাল্টে দিয়ে জাতীয় এলিটদের পুরাতন স্বৈরাচারকে আন্তর্জাতিক অর্থগোষ্ঠীর নতুন স্বৈরাচার দিয়ে প্রতিস্থাপিত করছে; বিশ্বায়ন-এর ফলে কোটি কোটি মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়েছে এবং তাদের জীবনে অনিশ্চয়তা বেড়েছে; বিশ্বায়ন যেভাবে চলছে আর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যেসব নিয়মকানুন বানাচ্ছে তাতে করে সংস্থাটিই এখন বৈশ্বিক অসমতা সৃষ্টি ও ভণ্ডামির প্রতীক (symbol) হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে; বিশ্বায়নের বিধি-বিধান যেভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে তাতে উন্নত বিশ্বের শিল্প পণ্য উন্নয়নশীল দেশে অবাধে ঢুকবে অথচ উন্নয়নশীল বিশ্বে উৎপাদিত পণ্য (বস্ত্র-সুতা-কৃষিজাত) অবাধে উন্নত বিশ্বে ঢুকতে পারবে না; বিশ্বায়নের আওতায় মেধাস্বত্ব আইন (intellectual property right) আসলে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি (intellectual fraud)। এসব কারণেই স্টিগলিজ বলছেন বিশ্বায়ন বাস্তবায়নে যে ধরনের ব্যবস্থাপনা চলছে (managing globalization অর্থে) তা পরিবর্তিত না হলে উন্নয়ন তো হবেই না বরঞ্চ দারিদ্র্য ও অস্থিতিশীলতা বাড়তে থাকবে; প্রয়োজন সেই সব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার যারা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শাসকের ভূমিকা পালন করছে এবং সে সংস্কারে বিশ্বায়নের মানবকল্যাণকামী সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হতে হবে (বলা হচ্ছে 'institute a more humane process of globalization' এর কথা)।[৩৫] আর নোয়াম চমস্কি সোজাসুজি বলছেন "বিশ্বায়ন ধনী দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বাড়াবে এবং বিশ্বে অর্থনৈতিক বিভাজন সম্প্রসারিত করবে।[৩৬]

বিশ্বায়নের অর্থ যদি উদারীকরণের নামে পুঁজি ও বাণিজ্যের অবাধ বিচরণ হয় সেক্ষেত্রে সবার চিন্তা উদ্রেকের জন্য 'গ্লোবালাইজেশন' বা বিশ্বায়ন নিয়ে একটা যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। ধনী বিশ্বের বিশ্বায়ন গুরুরা এ প্রশ্নটি ভয় করেন। বিশ্বায়নের আওতায় এখন পর্যন্ত মোটামুটি বিশ্বায়িত হবার প্রক্রিয়ায় আছে বাণিজ্যের বিশ্বায়ন (trade globalization)। যেখানে মূল কথা 'movement of goods is a substitute for the movement of people'[৩৭]। পুঁজির অবাধ চলাচল আর সেই সাথে স্বল্প ট্যারিফের ফলে শিল্প-কারখানাসহ ফার্ম তার শ্রমিককে বলতেই পারে যে যদি আমার শর্তে

[৩৫] বিস্তারিত দেখুন, Stiglitz, Joseph. E, 2002. Globalization and Its Discontents, pp. 244-252.

[৩৬] Noam Chomsky, 2003. Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance, p. 230.

[৩৭] Stiglitz, Joseph. E, 2013. The Price of Inequality, pp. 6-7.

অর্থাৎ আমার নির্ধারিত স্বল্প মজুরিতে এবং কর্ম পরিবেশ যা আছে তা মেনে নিয়ে কাজ না করতে চাও তাহলে আমি আমার কারখানা সরিয়ে ফেলবো, প্রয়োজনে অন্য দেশে নিয়ে যাবো– অর্থাৎ উন্নত দেশে শ্রমিকের মজুরিসহ কর্ম পরিবেশ নিয়ে দরকষাকষির সুযোগ নেই, আর সে কারণেই ধনী দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আসলেই নেই বললেই চলে। এখন আসা যাক ঐ প্রশ্নে যা ধনীদেশের বিশ্বায়নপন্থীরা ভয় পান। প্রশ্নটি সহজ: ধরুন আগামীকাল থেকে বিশ্বে যদি পুঁজির অবাধ চলাচল বন্ধ হয়ে শ্রমের অবাধ চলাচল পদ্ধতি চালু হয়ে যায় তাহলে বিশ্বের অর্থনীতির চেহারাটা কি হবে? কেমন রূপ নেবে? সেক্ষেত্রে প্রতিটি দেশ আরো আরো শ্রমিক পাবার প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হবে। আর তাইই যদি হয় তা হলে যে শ্রমিকদের আমদানি করা হবে তাদের আকর্ষিত করার স্বার্থে পুঁজিপতিকে কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে হবে: তোমাদের মজুরি ভাল দেয়া হবে, তোমাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ভাল স্কুলের ব্যবস্থা করা হবে, তোমাদের মজুরি থেকে খুবই স্বল্পমাত্রায় আয়কর কাটা হবে। আর এ সিদ্ধান্ত যদি নেয়াই হয় সেক্ষেত্রে পুঁজির উপর উচ্চ হারে কর বসাতে হবে। জোসেফ স্টিগলিজ বলছেন বর্তমান বিশ্বটা এরকম নয়, এবং অংশত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের rent seeker ১ শতাংশ পরজীবীরা এমনটা চাইতে পারে না (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭)।

বিশ্বায়নের যুগে বৈশ্বিক অর্থনীতির দৃশ্যপট এখন যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা থেকে সহজেই অনুমেয়: চিরাচরিত-প্রচলিত (traditional) চিন্তা দিয়ে হবে না; ঐ পথে হেঁটে লাভ হবে না; লাভ হবে নব্য-উদারবাদীদের কথা না শুনলে– আর শুনলে ক্ষতি গুণিতক হারে বাড়তেই থাকবে; লাভ হবে না এ কারণেও যে ধনী দেশ তাদের নিজ দেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফলাফল বিচার না করেই স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে তাদের পরীক্ষাগার (field of experiment অর্থে) ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে।[৩৮] আর ধনী বিশ্বের অনুকরণ করে লাভ হবে না কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই তো rent seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থ সে দেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়িয়েছে।

উপসংহার

আজকের উন্নত দেশসমূহ অতীতে তাদের নিজেদের অর্থনীতির উন্নয়নে কখনও নব্য-উদারবাদী মতবাদ গ্রহণ করেনি, বিপরীতে নিরঙ্কুশ সংরক্ষণবাদী নীতি (absolute protectionist policies) অবলম্বনে তারা উন্নয়নের আজকের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ঐ সব দেশ এখনও বিভিন্ন নামে নিজ দেশে সংরক্ষণবাদী নীতি-কৌশল চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এখন একমেরুর অসম প্রতিযোগিতার (non level playing field) বিশ্বে তারাই তাদের স্ব-স্বার্থ সংরক্ষণ ও তা বিকাশে অন্যদের (যারা স্বল্পোন্নত, অনুন্নত, উন্নয়নকারী) বাধ্য করছে যা তারা নিজেরা গ্রহণ করে নি, যা তারা নিজেরা মেনে চলে নি। সাম্রাজ্যবাদী ধনী বিশ্ব স্বল্পোন্নত, উন্নয়নকামী বিশ্বকে মুক্তবাজার, অবাধ বাণিজ্য, মুক্ত কর্ম প্রচেষ্টা (laissez faire, laissez passer), পুঁজির অবাধ চলাচল মানতে বাধ্য করছে এবং সে লক্ষ্যে এখন তারা বৈশ্বিক অর্থনীতির বাজার বিধি, ব্যবসায় বাণিজ্য বিধি সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে প্রণয়ন করছে এবং দরিদ্র বিশ্বের দারিদ্র্যের সুযোগে তাদের এসব মানার সবক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, করছে, করবে।

[৩৮] বিস্তারিত দেখুন, Piketty, Thomas. 2014. Capital in the Twenty-First Century. pp. 471-492.

উল্লিখিত কারণেই নব্য-উদারতাবাদী অর্থনীতি শাস্ত্রকে নির্দ্বিধায় পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তর সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসত্বের উলঙ্গ দর্শন হিসেবে অভিহিত করলে আদৌ কোন অত্যুক্তি হবে না। নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি শাস্ত্র এবং তার প্রায়োগিক বিধি-বিধান অর্থনীতি শাস্ত্রে 'দর্শনের দারিদ্র্যই' শুধু নয় 'দর্শনের চরম দারিদ্র্য' বৈ কিছু নয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ জরুরি। যত দ্রুত ততই মঙ্গল। অন্যথায় যারা এ দর্শনের বিক্রেতা সববরাহকারী (ধনী দেশ) এবং যারা এ দর্শনের ক্রেতা-ভুক্তভোগী ভোক্তা (দরিদ্র দেশ) দীর্ঘমেয়াদে উভয়েরই ক্ষতি-বিপর্যয় অনিষ্ট।

এ বিপর্যয় রোধে অর্থনীতি শাস্ত্রের কাজ হবে আধুনিক অসম বিশ্বের রাজনৈতিক-অথনীতির অন্তর্নিহিত নিয়ামক বিষয়াদির বস্তুনিষ্ঠ নির্মোহ বিশ্লেষণপূর্বক "নূতন এক একীভূত অর্থশাস্ত্র" বিনির্মাণ করে তারই ভিত্তিতে "নূতন মানবিক উন্নয়ন দর্শন বিনির্মাণ করা যার কার্যকর প্রয়োগ ধনী দেশের ক্রমবর্দ্ধমান বৈসম্য-অসমতা রোধ করতে সক্ষম হবে এবং একই সাথে যা দরিদ্র দেশের মানবিক উন্নয়ন (humane development) প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে। এ দর্শনের ভিত্তি হতে হবে 'বৈশ্বিক লাভ', 'বৈশ্বিক প্রগতি'। বিষয়টি অর্থনৈতিক, তবে সমাধান রাজনৈতিক। যেহেতু মানুষের বিবর্তনে ৯৯ শতাংশ সময় কেটেছে সমতা ভিত্তিক সমাজিক কাঠামোতে, যেহেতু মানুষ যে অর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বাস করে তা স্থির-অনড় নয় নিয়ত পরিবর্তনশীল, যেহেতু বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ মানুষকে উত্তরোত্তর অধিক হারে আলোকিত করতে থাকবে, এবং যেহেতু উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশ বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্ককে পাল্টে দেবে সেহেতু প্রাকৃতিক কারণেই মানব কল্যাণকামী এ সমাধান হবে— ব্যাপারটি সময়ের। আর আমাদের কাজ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

অর্থনীতি শাস্ত্রের বিকাশ ইতিহাস সংশ্লিষ্ট দর্শন সহায়ক প্রবন্ধ-গ্রন্থসমূহ

বারকাত, আবুল. (২০১৪), "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে" *বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "লোকবক্তৃতা ২০১৪", ২২ মার্চ ২০১৪ (৮ চৈত্র ১৪২০)*, সিনেট ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বারকাত, আবুল. (২০১২ক), 'বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি', জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা-২০১২, জাহানারা ইমাম স্মরণসভা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ডব্লিউভিএ মিলনায়তন, ঢাকা: ২৬ জুন ২০১২।

বারকাত, আবুল. (২০১২খ), শাহ এএমএস কিবরিয়া স্মারক বক্তৃতা-২০১২, 'বাংলাদেশে দারিদ্র্য চিন্তা: ভাবনার দারিদ্র্য যেখানে প্রকট', বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, ঢাকা: ২৭ জানুয়ারী ২০১২, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

বারকাত, আবুল. (২০০৬). 'একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্য চিন্তা: বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি', বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, আঞ্চলিক সেমিনার, রাজশাহী: ১৫ জুলাই ২০০৬।

বারকাত, আবুল. (১৯৮৫). বিশ্ববীক্ষার বিষয়: সম্পাদকের বক্তব্য। আবু মাহমুদ রচিত *মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা, ১ম সংস্করণ, খণ্ড ১*. ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

মার্কস, কার্ল. (১৯৮৮). *পুঁজি.* খণ্ড ১, অংশ ১। মস্কো: প্রগতি প্রকাশন।

ফাসফেল্ড, ড্যানিয়েল. (১৯৯১).*অর্থনীতিবিদদের যুগ*. (বঙ্গানুবাদ, ড. আবদুল্লাহ ফারুক. ঢাকা: বাংলা একাডেমি)।

ARROW, K. J. (2008). Arrow's theorem. In: Durlauf, S. N. and Blume, L. E. *The new Palgrave dictionary of economics (8 volume set)* (2nd ed.).Basingstoke, Hampshire New York: Palgrave Macmillan.

ARROW, K. J. and DEBREU, G. (2001). *Landmark papers in general equilibrium theory, social choice and welfare*. Cheltenham, UK Northampton, Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing.

ARROW, K.J. (1983). *Collected papers of Kenneth J. Arrow*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

ARROW, K. J. (1984). *Collected papers of Kenneth J. Arrow, volume 4: the economics of information*. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press.

ARROW, K. J. (1985a). *Collected papers of Kenneth J. Arrow, volume 5: production and capital*. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press.

ARROW, K.J. (1985b). *Collected papers of Kenneth J. Arrow, volume 6: applied economics*. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press.

ARROW, K.J. (1974). *The limits of organization*. New York: Norton.

ARROW, K. J. (1970). *Essays in the theory of risk-bearing*. Amsterdam: North-Holland Pub. Co.

ARROW, K.J. (1968). Economic equilibrium. In: Merton, Robert K. and Sills, David L.(ed.) *International encyclopedia of the social sciences (vol. 4)*. London and New York: Macmillan and the Free Press.

ARROW, K.J., SUPPES, P. AND KARLIN, S. (1960). *Mathematical models in the social sciences, 1959: Proceedings of the first Stanford symposium*. Stanford, California: Stanford University Press.

ARROW, K.J. (1959). Functions of a theory of behavior under uncertainty. *Metroeconomica*. 11(1-2). pp.12-20.

ARROW, K. J. and Hurwicz, L. (1953). *Hurwicz's optimality criterion for decision making under ignorance*. Technical Report 6. Stanford University.

ARROW, K. J.(1951). *Social choice and individual values*. New York: John Wiley & Sons, Inc ; London: Chapman & Hall.

BARKAT, A. (2005). *Right to Development and Human Development: The Case of Bangladesh.* Sida and FÖreningen for SUS, Sida Auditorium, Stockholm. March 2005. Sweden: Sida and FÖreningen for SUS.

BELL, JOHN F. (1967). *A History of Economic Thought.* Second edition. New York: The Ronald Press Company.

BENTHAM, J. (1789). *An introduction to the principles of morals and legislation*. London: T. Payne.

BENTHAM, JEREMY. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. 1st edition. Oxford: Clarendon Press.

BLAUG, MARK. (1968). *Economic Theory in Retrospect*. Heinemann Educational Publishers; 2nd Revised edition.

BLOMGREN, ANNA-MARIA. (1997). Nyliberal politisk filosofi. En kritisk analys av Milton Friedman, Robert Nozick och F.A. Hayek. Nora: Bokforlaget Nya Doxa.

CHANG, HA-JOON. (2008). *Bad Samaritans: The Myth of Free Tread and the Secret History of Capitalism.* NY: Bloomsburg Press.

CHANG, HA-JOON and GRABEL, ILENE. (2005). *Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual*. Zed Books Ltd.

CHARLES GIDE and CHARLES RIST. (1948).*A History of Economic Doctrine*. George G. Harrap& Co Ltd; 2nd Edition.

CHOMSKY, N. (2003). *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance.*London: Penguin Books.

CHOMSKY, N. (2005). *Imperial Ambitions*. London: Penguin Books.

CHOMSKY, N. (2006). *Failed States: The Abuse of Power and The Assault on Democracy.* London: Penguin Books.

CHOMSKY, N. (2007). *Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the Real World.*New Delhi: Viva Books Private Limited.

COHEN, JOEL. E. (1996). *How Many People Can the Earth Support*.W.W. Norton & Company.

COMMONS, JOHN R. (1899). *Theory of the Labour Class.*

DEANE, PHYLLIS. (1978). *The Evolution of Economic Ideas*.Cambridge University Press, Oct 5, 1978.

DOBB, MAURICE. (1973). *Theories of Value and Distribution since Adam Smith: Ideology and Economic Theory*. Cambridge University Press, 1973.

ENGELS, F. (1972). *The Origin of the Family, Private Property and the State* .New York : Pathfinder

FOURIER, C. (1971). *Design for utopia*. New York: Schocken Books.

FOURIER, C. and POSTER, M. (1971). *Harmonian man*. Garden City, N.Y.: Doubleday.

FRIEDMAN, M., SAVAGE, L. AND BECKER, G. (2007). *Milton Friedman on economics*. Chicago: University of Chicago Press.

FRIEDMAN, M. (1991). Quantity Theory of Money. In: Eatwell, J., Milgate, M. and Newman, P. *The New Palgrave*. New York: Norton.

FRIEDMAN, M. and LEUBE,KURT R. (1987).*The Essence of Friedman.* Stanford, Calif: Hoover Institution Press.

FRIEDMAN, M. and FRIEDMAN, ROSE D. (1980). *Free to Choose*. New York: Harcourt Brace Jovanvich.

FRIEDMAN, M. (1977). Nobel Lecture: Inflation and Unemployment. *Journal of Political Economy*. 85.

FRIEDMAN, M. (1962). *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press.

FUSFELD, DANIEL R. (1972). The Rise of the Corporate State in America.*Journal of Economic Issues*.

FUSFELD, DANIEL. R. (1982).*The Age of the Economist*. Scott, Foresman and Company.

GIDDENS, A. (2003). *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*. N.Y: Routledge.

GRAY, A. (1931; 1961). *The Development of Economic Doctrine: An Introductory Survey*. London: Longmans, Green.

HALEVY, E. (1952). *The Growth of Philosophic Radicalism*. Reprinted. Trans. Morris, M. London: Faber and Gwyer.

HARVEY, D. (2009*). Reshaping Economic Geography: The World Development Report 2009***.** The Hague: Institute of Social Studies.

HARVEY, D. (2007). *A Brief History of Neoliberalism.*Oxford: Oxford University Press

HARVEY, D. (2006). *Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development.* London: Verso.

HARVEY, DAVID. (2005). *A Brief History of Neoliberalism.* Oxford: Oxford University

HARVEY, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford: Oxford University Press.

HARVEY, D. (1996). *Justice, nature, and the geography of difference*. Cambridge, Mass.: Blackwell Publishers.

HARVEY, D. (1982). *The limits to capital*. Chicago: University of Chicago Press.

HAYEK, F. A. and HAMOWY, R. (2011). *The constitution of liberty*. Chicago: University of Chicago Press.

HAYEK, F.A and KLEIN, P. (1992). *The fortunes of liberalism*. Chicago: University of Chicago Press.

HAYEK, F. A. (1973). *Law, Legislation and Liberty: A new Statement of the Liberal Principles and Political Economy.Volume 1: Rules and Order*. London: Routledge.

HAYEK, F.A. (1944). *The Road to Serfdom.* Chicago: University of Chicago press.

HEGEL, G. W. F. (1962). *Lectures on the philosophy of religion*. London: Routledge & Kegan Paul.

HEGEL, G. W. F. and SIBREE, J. (1902). *Lectures on the philosophy of history*. London: G. Bell and Sons.

HEGEL, G.W. F. (1894). *Lectures on the Philosophy of History*.London: H. G. Bonn.

HUMAN DEVELOPMENT REPORT (2013). *The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World*. New York: UNDP.

HUME, D. (1961). *A treatise of human nature*. Garden City, N.Y.: Doubleday.

HUME, D. (1894). *An enquiry concerning the human understanding*. Oxford: Clarendon Press.

HUME, D. (1752). *Political discourses*. Edinburgh: Printed by R. Fleming, for A. Kincaid and A. Donaldson.

JEVONS, W. S. (1876). The future of political economy. *Forthnightly Review.* 19.

JEVONS, W. S. (1879). Methods of social reform, II: A state parcel post. The Contemporary Review. 34.

JEVONS, W.S. (1866). Brief account of a general mathematical theory of political economy. *Journal of the Royal Stitistical Society.* 29. pp. 282-287.

JEVONS, W. S. (1869). *The substitution of similars, the true principle of reasoning*. London: Macmillan & Co.

JEVONS, W. S. (1883). *Methods of social reform*. London: Macmillan and Co.

JEVONS, WILLIAM S. (1871). The Theory of Political Economy. Reprint. Harmondsworth: Penguin Books.

JEVONS, WILLIAM S. (1866). The Coal Question. 2d ed. London: Macmillan. Available online at: http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnCQ.html.

KAPLAN, S. (1976). *Bread, politics and political economy in the reign of Louis XV*. The Hague: Martinus Nijhoff.

KEYNES, J. M. (1965). *A Treatise on money*. New York: Harcourt, Brace and company.

KEYNES, J. M. (1956). *Essays and Sketches in Biography*. New York: Meridian Books.

KEYNES, J. M. (1940). *How to pay for the war, a radical plan for the chancellor of the exchequer*. London: Macmillan.

KEYNES, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money.* London: Macmillan and Co.

KEYNES, J. M. (1931). The End of the Gold Standard .*Sunday Express,* 27 Septemper 1931.KEYNES, J. M. (1920). *The Economic Consequences of the Peace*. New York: Harcourt, Brace, and Howe.

KEYNES, J.M. (1926). *The end of laissez-faire*. London: L. & Virginia Woolf.

KEYNES, J. M. (1920). *The economic consequences of the peace*. New York: Harcourt, Brace and Howe.

KEYNES, J. M. (1915). The Economics of War in Germany. *The Economic Journal*, 25(99), p.443.

KRUGMAN, P. (2013). *End This Depression Now*. W.W. Norton & Company, Inc.

KRUGMAN, P. (2012). *End this depression now!*. New York: W.W. Norton & Co.

KRUGMAN, P., WELLS, R. and GRADDY, K. (2008). *Economics*. New York]: Worth Publishers.

KRUGMAN, P. (2007). *The conscience of a liberal*. New York: W.W. Norton & Co.

KRUGMAN, P. (1994). *Peddling prosperity*. New York: W.W. Norton.

KUAN, L. Y. (2000). *From Third World to First,The Singapore Story: 1965-2000*. Marshall Cavendish Editions.

LETWIN, W. (1963). *The Origins of Scientific Economics: English Economic Thought, 1660-177*.Methuen & Co., 1963.

LOCKE, J. (1990). Questions Concerning the Law of Nature. In: Robert Horwitz et al. *Questions Concerning the Law of Nature.* Ithaca: Cornell University Press.

LOCKE, J. (1969). *Two Treatises of Government.* London: C. and J. Rivington.

LOCKE, J. (1692). *Some considerations of the consequences of the lowering of interest, and raising the value of money*. London: Printed for Awnsham and John Churchill

MALTHUS T.R. (1959). *Population: The First Essay*. The University of Michigan Press, Ann Arbor Books

MALTHUS, T. (1951). *Principles of political economy.* New York: Kelley. MALTHUS, T. (1824). Political economy. *Quarterly Review* 30 (60). pp. 297–334.

MALTHUS, T. (1817). *An Essay On The Principle Of Population; Or A View Of Its Past And Present Effects On Human Happiness; With An Inquiry Into Our Prospects Respecting The Future Removal Or Mitigation Of The Evils Which It Occasions*. London: Cllowes.

MALTHUS T.R. (1798a). *An Essay on the Principle of Population*. Reprint.Oxford World's Classics.

MALTHUS, T. et al. (1798b). *An Essay on the Principle of Population, as it affects the future improvement of Society; with remarks on the speculations of W. Godwin, M. Condorcet and other writers.* London: Anonymous.

MANDEVILLE, B. (1962). *The Fable of the Bees*. Capricorn Books.

MANDEVILLE, B. (1733). *The fable of the bees*. London: Printed and sold by J. Roberts.

MANDEVILLE, B. (1732). *An enquiry into the origin of honour, and the usefulness of Christianity in war. By the author of The fable of the bees*. London: Printed for John Brotherton.

MARX, K. and ENGELS, F. (1848). *The Communist Manifesto*. New York: Penguin group.

MARX, K. (1872). *Das Capital.*Hamburg: Otto Meissner.

MARX, K. (1867). *A Critique of Political Economy*. Reprinted.New York: Penguin Books.

MENGER, K. (1979). *Selected papers in logic and foundations, didactics, economics*. Dordrecht: D. Reidel Pub. Co.

MENGER, K. (1973). Austrian Marginalism and Mathematical Economics. In: Hicks, J. R. and Weber, W.(eds) *Carl Menger and the Austrian School of Economics.* Oxford: Oxford University Press.

MENGER, K. (1967). The Role of Uncertainty in Economics. In: Shubik, M. (ed.) *Essays in Mathematical Economics in Honor of O. Morgenstern*. Princeton: W. Schoellenkopf and W. G. Mellon.

MENGER, K. (1938). An Exact Theory of Social Groups and Relations. *American Journal of Sociology* . 43. pp. 790-798.

MENZER, C. (1871). *Principles of Economics*. New York: New York University Press.

MICHAEL ST. J. P. (1954). *The Life of John Stuart Mill*. London: Secker & Warburg, GB (1954); New York: MacMillan.

MILL,J. S. (1848), *Principles of Political Economy* London: Longmans, Green and Co.

MISES, LUDWIG von. (1960; 1976). *Epistemological Problems of Economics*.New York: New York University Press.

MISES, LUDWIG von. (1957; 1969). *Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution*. New Rochelle, N.Y.: Arlington House.

MISES, LUDWIG von. (1949; 1966). *Human Action: A Treatise on Economics*. Chicago: Henry Regnery.

MITCHELL, C.WESLEY. (1966). *Lecture Notes on Types of Economic Theory*.New York, A. M. Kelley, 1949; monographic text.

MONROE, ARTHUR E. (1945). *Early Economic Thought: Selections from Economic Literature prior to Adam Smith.*Fifth Edition. Cambridge (Mass.): Harvard University Press;

MOORE, T. (1840a). Thoughts on Mischief. *Morning Chronicle,* 2 May 1840.

MOORE, T. (1840b). Religion and Trade. *Morning Chronicle,* 1 June 1840.

MURRAY, R. ([1962/1970] 2004. Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles- Power and Market: Government and the Economy.

NICHOLAS, GEORGESCU R. (1971). *The Entrophy Law and the Economic Process.*

NORTH, D. (1846). *Discourses upon trade*. Edinburgh: A. and C. Black.

NORTH, SIR D. (1691). *Discourses upon Trade*.A Reprint of Economic Tracts in 1907. Baltimore: The Johns Hopkins Press.

OWEN, R. (1813). *A new view of society, or, Essays on the principle of the formation of the human character, and the application of the principle to practice*. London: Printed for Cadell and Davies.

OWEN, R. and CLAEYS, G. (1993). *Selected works of Robert Owen*. London: W. Pickering.

OWEN, R. M. (1813).*A New View of Society*.University of Michigan.

PERKINS, J. (2006). *Confessions of An Economic Hit Man. The shocking inside story of how America REALLY took over the world*.Lodon: Ebury Press.

PETTY, W. (1691). *The Political Anatomy of Ireland*.

PETTY, W. (1690). *Political Arithmetic, etc.* Calvel.

PETTY, W. (1679). *A treatise of taxes and contributions*. London: Printed for Obadiah Blagrave.

PETTY, W. (1662). *A Treatise on Taxes and Contributions*. London: Obadiah Blagrave.

PHILLIPS, W.A. (1958). The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the U.K. 1861-1967". *Economics*. 25.

PIERO, S. (1955). The Works and Correspondence of David Ricardo: Biographical Miscellany. Cambridge: Cambridge University Press, 1955.

PIKETTY, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. The Belknap Press of Harvard University.

PLATO. (2000). *The republic*. (Ferrari, G. and Griffith, T. Trans.) Cambridge: Cambridge UniversityPress.

POLANYI, K. (1944). (published paperback 1957). *The Great Transformation*. New York: Farrar & Rinehart, inc.

QUESNAY, F. (1758). Tableau économique.Akademie-Verlag, 1965; Free Press, 1817.

RAE, J. (1895). *Life of Adam Smith*. New York: Kelley.

RAGHURAM, G. RAJAN. (2010). *Fault Lines: How Hidden Fractures still Threaten the World Economy.* Princeton University Press.

RICARDO, D. (1911). *On the principles of political economy and taxation*. London : J. M. Dent & sons, ltd.

RICARDO, D. (1817).*On the Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.

RIMA, IRENE H. (1972). *Development of Economic Analysis. The Irwin series in economics*. Revised edition.

ROLL, E. (1956). *A History of Economic Thought*.Thirdedition.NJ: Prentice-Hall Englewood Cliffs.

SAAD-FILHO, A. and JOHNSTON, D. (2005). Introduction.In: Saad-Filho,A.& JohnstonD. (eds). *Neoliberalism – A Critical Reader*.

SAAD-FILHO, A. and JOHNSTON,D. (2005). *Neoliberalism – A Critical Reader.* London: Pluto Press.

SACHS, J. (2012). *The Price of Civilization: Reawakening Virtue and Prosperity after the Economic Fall.*London: Vintage Books.

SAMUELSON, P. and BARNETT, W. (2007). *Inside the economist's mind*. Malden, MA: Blackwell Pub.

SARGENT, THOMAS J. and WALLANCE, N. (1976). Rational Expectations and the Theory of Economic Policy.*Journal of Monetary Economics.* 2.

SAY, JEAN-BAPTISTE. (1880; 1971). *A Treatise on Political Economy: or the Production, Distribution and Consumption of Wealth.* New York: Augustus M. Kelley.

SAY, JEAN-BAPTISTE. (1936). *Letters to Thomas Robert Malthus on political economy and stagnation of commerce*. London: G. Harding's Bookshop Ltd.

SCHUMPETER, JOSEPH. A. (1954). *A History of Economic Analysis*. New York: Oxford University Press.

SEN, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, Inc.

SMITH, A. (1759). *The theory of moral sentiments*. London: A. Miller.

SMITH, A. (1776). *The Wealth of Nations.* London : J.M. Dent & Sons ; New York : E.P. Dutton.

SPENCER, H. (1864). The survival of the Fittest.In:SPENCER, H *The Principles of Biology*. London:Williams and Norgate.

STARK, WERNER. (1944). *The Ideal Foundations of Economic Thought: Three essays on the philosophy of economics (Ed. Mannheim, Karl.)*.First Edition.Oxford University Press.

STIGLITZ, JOSEPH. E. (2013). *The Price of Inequality*. Penguin Books.

STIGLITZ, JOSEPH. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. Penguin Books.

TAWNY, RICHARD H. (1947). *Religion and the Rise of Capitalism*. New York: Harcourt,Brace in.

TOMMASO, CAMPANELLA. (1623). *The City of the Sun (Alternate titles: "La città del sole"; Latin: Civitas Solis)*. Create Space Independent Publishing Platform (14 Jan 2013).

TURGOT, A. (1795). *Reflections on the formation and distribution of wealth*. London: Printed by E. Spragg.

TURGOT, A. and GROENEWEGEN, P. (1977). *The economics of A.R.J. Turgot*. The Hague: Martinus Nijhoff.

TURGOT, A. and MEEK, R. (1973). *Turgot on progress, sociology and economics*. Cambridge [England]: University Press.

VEBLEN,T. (1904). *The Theory of Business Enterprise*. Reprint edition. New York: Charles Scribner's Sons.

VEBLEN, T. (1954). The Theory of the Leisure Class. New York: Macmillan,. 1899. New York: New American Library, Mentor Edition.

VEBLEN, THORSTEIN (1934; 1899). *The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. Introduction by Stuart Chase.* New York: The Modern Library.

WALRAS, L. AND JAFFÉ, W. (1965). *Correspondence of Léon Walras and related papers*. Amsterdam: North-Holland Pub. Co.

WILLIAMSON., J. (1990a). What Washington Means by Policy Reform.In: Williamson, J. (ed). *Latin American Adjustment: How much Has Happened*. Washington, DC: Institute for International Economics.

WILLIAMSON., J. (1990b). What Washington Means by Policy Reform In: Williamson, J. (ed). *Latin American Adjustment: How much Has Happened*.